বইটিতে নতুন আঙ্গিকে সুবিন্যস্তভাবে, সরল ও সাবলীল ভাষায়
মহিলাদের পবিত্রতার বিধি-বিধানগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে

মহিলাদের পবিত্রতার মাসায়েল

[হায়েয-নিফাস প্রসঙ্গ]

মুফতি রহমতুল্লাহ্



মহিলাদের পবিত্রতার মাসায়েল

(হায়েয-নিফাস প্রসঙ্গ)

মুফতি রহমতুল্লাহ
উস্তাদ : চন্দ্রা দারুল উলুম মাহমুদ নগর মাদরাসা,
চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

মাকতাবায়ে ইবনে উবায়েদ
কুঞ্জেরহাট, বোরহান উদ্দীন, ভোলা

মহিলাদের পবিত্রতার মাসায়েল
(হায়েয-নিফাস প্রসঙ্গ)
মুফতি রহমতুল্লাহ
০১৯৮৩৪৩২৬৫১
০১৬২০৪৮১৯২৯

প্রকাশক
মুফতি রহমতুল্লাহ

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৩৬
ডিসেম্বর ২০১৪

প্রচ্ছদ
মাও. আনওয়ারুল ইসলাম
উস্তাদ : জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ

কম্পিউটার কম্পোজ
এম. হক কম্পিউটার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য
১০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
জননী প্রিন্টার্স
শিংটোলা, ঢাকা

উৎসর্গ

আমার প্রাণপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় আব্বু-আম্মু
এবং আমার মুরশিদ হযরতুল আল্লাম
মুফতি মাসউদুল কারীম দা.বা. এবং
সকল আসাতেযায়ে কেরাম ও ভাই-বোনদে
নেক হায়াত ও দরজা বুলন্দির কামনায়–

লেখক

প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুল হেরা ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার ০১৯১৮৮৬৩০৫৬	**মুফতি যুবায়ের মাহমুদ** দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম ফুলবাগিচা মাদরাসা লালমোহন, ভোলা ০১৭৭৮৭৪৭২৪৫
মাকতাবাতুদ্দাওয়া উত্তরা, ঢাকা ০১৭৫৫৫৬৯৯৬৪	**মাও. আনোয়ারুল ইসলাম সাহেব** জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম, ফরিদাবাদ ০১৭১৭৫০৩৪৬০
মুফতি রিয়াজ উদ্দিন সাহেব কাশিপুর মাদরাসা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ০১৭২৭৯৫২০০১	**মুফতি আব্দুল বাসিত সাহেব** রানাভোলা মদিনাতুল উলূম মাদরাসা উত্তরা, ঢাকা ০১৯২৯০৫৬৭৭৮২
মাওলানা বদরুজ্জামান টঙ্গী দারুল উলূম মাদরাসা চেরাগ আলী, টঙ্গী, গাজীপুর	

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

দুটি কথা

হায়েয-নিফাস মহিলাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। কোন মহিলা এমন নেই যে এতদুভয় থেকে মুক্ত। আর কিভাবে মুক্ত থাকবে, আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। বুখারী শরীফে এসেছে, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন :

ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم ـ

অর্থ : হায়েয এমন একটি জিনিস যা আল্লাহ তায়ালা মেয়ে জাতির জন্যে স্বভাবজাতভাবে অবধারিত করে দিয়েছেন। (বুখারী : ৫৫৪৮; কিতাবুল আযাহী)

হায়েয-নিফাসের সাথে অনেক শরয়ী বিধি-বিধান সম্পৃক্ত রয়েছে। যা আমাদের সমাজের খুব সল্প সংখ্যক মানুষই জানেন। কি পুরুষ কি মহিলা? সবার মাঝে এ ব্যাপারে শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়। সবাই এ ব্যাপারে খুব উদাসীন। যা আমাদের জন্যে বড়ই আফসোসের বিষয়। কেননা তা পবিত্রতা-ত্বহারাত ও ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে আমাদের উদাসীনতার প্রমাণ বহন করে।

আর উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হল, শরীয়তের যেবিষয়ে মানুষ উদাসীন হয়ে যায়, হাল ছেড়ে দেয়, সে বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করবে। মানুষের হাল ধরবে। আর সে দায়িত্ববোধের তাগিদে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে, হায়েয-নিফাস সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানোর খুবই প্রয়োজন বোধ করছি, অনেক আগ থেকে।

এর মধ্যে উস্তাদে মুহতারাম মাও. আবুল কাশেম (দা.বা.) এ ব্যাপারে দু'কলম লেখার নিদেশ দিয়েছেন। তাই এ অধম হায়েয-নিফাস সংক্রান্ত কিছু বিধি-বিধান সন্নিবেশ করতে প্রয়াস পেয়েছি। যা বক্ষমান পুস্তিকা রূপে প্রকাশিত হয়ে আপনাদের হাতে পৌঁছতে যাচ্ছে।

বক্ষমান পুস্তিকাটিতে যদি কোন উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয় এবং তা পাঠক মহলের হৃদয় আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং তা হৃদয়গ্রাহী বলে বিবেচিত হয় তাহলে তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। তার অনুগ্রহ অনুদানে।

আর যদি কোন ত্রুটি ও কমতি পরিলক্ষিত হয়, তা শয়তানের পক্ষ থেকে এবং এ অধমের কমতি-অপারগতার কারণে। অতএব পাঠক মহলের কাছে কোন ভুল ধরা পড়লে তা আমাদেরকে অবগত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সুধরে নিবো। ইনশাআল্লাহ।

এ মুহূর্তে অনেকের কথা মনে পড়ছে, যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের মধ্যে মাওলানা আনোয়ারুল ইসলাম, মুফতী যুবাইর মাহমুদ, মাও. নজরুল ইসলাম, মাও. আল আমিন, ডা. জাহিদ ও বন্ধু রফিক ও মুফতি আব্দুল বাসিত ও বোন মানসুরা বেগম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আরো যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আমি এখানে স্মরণ করছি। তাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তায়ালা সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুক। আমিন।

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, পীরে কামেল, শাইখুল হাদীস, টঙ্গী দারুল উলূম মাদ্রাসার স্বনামধন্য মুহতামিম হযরতুল আল্লাম

মুফতি মাসউদূল করীম দা. বা.-এর

বাণী

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এ জন্যে যে, ছাত্রজীবন থেকে আমার আদরের ছাত্র মুফতি রহমতুল্লাহর লেখালেখির প্রতি বেশ আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। বর্তমানে সে "মহিলাদের পবিত্রতার মাসায়েল" নামে একটি সংকলন তৈরি করেছে, যা এ বিষয়ে বিশদ বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ, যা পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবে।

আমি সংকলক ও তার সংকলনের মাকবুলিয়াতের জন্যে দোয়া করছি। আল্লাহ তায়ালা যেন একে একটি উপকারী প্রচেষ্টা হিসেবে কবুল করেন।

সংকলকের হায়াতে তায়্যিবাহ ও তার আরও বহুমুখী দ্বীনী খেদমতের তাওফিক কামনা করছি।

৩০/১২/১৪৩৫ ইং

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম ফুলবাগিচা কওমী মাদরাসার স্বনামধন্য পরিচালক, বিশিষ্ট আলেমে দীন, **মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কাশেম সাহেব দা. বা.**-এর

বাণী

নাহমাদুহু ও নুসল্লী আলা রাসুলিহিল কারীম।

নারীদের হায়েয-নেফাস, ঋতুকালীন স্রাব ইত্যাদি সম্পর্কে বাংলা ভাষায় একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করে আসছি। কারণ, এ ব্যাপারে আমাদের মুসলিম নারী সমাজ একেবারে অজানা। তাই আমার স্নেহের ছাত্র মুফতী রহমতুল্লাহকে এ জিম্মাদারী পালনের নির্দেশ প্রধান করেছিলাম।

আলহামদুল্লিহ মুফতী রহমতুল্লাহ আমার নির্দেশ পেয়ে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার পান্ডুলিপির কিছু অংশ আমি দেখেছি এবং খুব খুশি হয়েছি। আমার দোয়া ও একান্ত কামনা হল আল্লাহ তায়ালা এ গ্রন্থ খানাকে কবুল করুন এবং লেখককেও কবুল করুন। আর এ গ্রন্থকে উপকারী ও কল্যাণকর গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আমিন।

১৪/০২/২০১৪ ইং

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

হায়েযের (মাসিক বা ঋতু স্রাবের) সংজ্ঞা ১৫
হায়েযের রোকন ও শর্তসমূহ..... ১৫
হায়েযের (মাসিক বা ঋতু স্রাবের) সূচনা..... ১৭
স্রাব তিনদিন পর্যন্ত প্রলম্বিত হলে হায়েয, নতুবা ইস্‌তেহাযা..... ১৮
স্রাব তিনদিন প্রলম্বিত হওয়ার আগ পর্যন্ত
হায়েযগ্রস্তদের মতই আমল করে যাবে..... ১৮
দু'হায়েযের (মাসিকের) মাঝে অন্তবর্তী পবিত্রতার বিবরণ ১৯
অপূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা ও তার ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পাওয়া স্রাবের বিবরণ..... ২০
হায়েয ও পবিত্রতায় সাধারণ আদত ও নিয়ম..... ২২
আদত-অভ্যাস অতিরিক্ত স্রাব-নির্ণয় মূলনীতি..... ২৩
আদত অভ্যাস অতিরিক্ত স্রাবে রোজা নামায ২৪
হায়েযের আদতের পূর্বে বা পরে স্রাব দেখা দিলে তার বিধান..... ২৫
হায়েযের আদত ও মেয়াদের অনিয়ম
তথা আগে পরে যে স্রাব আসে তাতে কিভাবে দিন কাটাবে? ২৬
হায়েযের ফাঁকে ফাঁকে স্রাবহীনতার অনুপ্রবেশ..... ২৭
হায়েযের ফাঁকে ফাঁকে যে স্রাবহীনতা পরিলক্ষিত হয় তার হুকুম..... ২৭
হায়েযের ফাঁকে ফাঁকে যে স্রাবহীন মুহূর্তগুলো
পরিলক্ষিত হয় তা কিভাবে কাটাবে?..... ২৯
যে যে রঙের হায়েয পরিলক্ষিত হয়ে থাকে..... ৩০
হায়েয নিরাশার বয়স ৩১
নিফাসের সংজ্ঞা ও নিফাসের বিস্তারিত বিবরণ ৩২
নিফাসের সংজ্ঞা..... ৩২
অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব ও তারপর নির্গত হওয়া স্রাব..... ৩৩
এম আরের পর নির্গত স্রাবের হুকুম..... ৩৪
একই গর্ভে একাধিক সন্তান জন্মালে তখন নিফাসের হুকুম ৩৫
সিজার পরবর্তী স্রাবের হুকুম..... ৩৬
স্রাবহীন বাচ্চা প্রসব..... ৩৬
নিফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মেয়াদ..... ৩৭
আদত অতিরিক্ত স্রাবে ইবাদাত বন্দেগীর বিধান ৩৭
নিফাসের মাঝে মাঝে স্রাবহীনতার অনুপ্রবেশ ৩৮

বিষয় পৃষ্ঠা
নিফাসের ফাঁকে ফাঁকে যে স্রাবহীন সময় দেখা যায় তার হুকুম ৩৮
নিফাস এর ফাঁকে ফাঁকে পরিলক্ষিত স্রাবহীন মুহূর্তগুলো কিভাবে কাটাবে? ... ৩৯
নিফাস ও হায়েযের মাঝে অন্তবর্তী পবিত্রতার বিবরণ ৪০
নিফাসে (প্রসব পরবর্তী স্রাবে) মহিলাদের কুসংস্কার ৪২
ইন্‌জেকশন ও ঔষধের কারণে হায়েয-নিফাসে অনিয়ম ৪২
ইনজেকশন বা ঔষধের প্রভাবে হায়েয-নিফাস বন্ধ হলে,
তাতে রোজা নামায ইত্যাদির বিধান ৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

হায়েয-নিফাসের হুকুম ৪৪
হায়েয-নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় রোজা-নামায ৪৪
হায়েয-নিফাস বন্ধ হলে রোজাগুলো কাযা করবে,
নামায কাযা করা লাগবে না ৪৫
গোসলের সময় ৪৭
রোজা অবস্থায় হায়েয প্রকাশ পেলে করণীয় ৪৮
জাগ্রত হয়ে হায়েয দেখতে পেলে তার হুকুম ৪৮
জাগ্রত হয়ে হায়েয বন্ধ পেলে তার হুকুম ৪৯
নফল নামায-রোজায় স্রাব প্রকাশ পেলে কী করণীয় ৪৯
সিজদায়ে তেলাওয়াতের হুকুম ৫০
হায়েয-নিফাস অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করার বিধান ৫০
তাফসীর গ্রন্থ স্পর্শ করার বিধান ৫১
ফাযায়েলে আমাল ও অন্যান্য ধর্মীয়গ্রন্থ স্পর্শ করার বিধান ৫১
কুরআন কারীম তেলাওয়াতের বিধান ৫১
হেফজুল কুরআন সহ কুরআনের শিক্ষিকা ও
শিক্ষার্থীদের জন্যে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান ৫২
মোবাইলে তেলাওয়াত ও কুরআন স্পর্শের হুকুম ৫২
কুরআনুল কারীম শ্রবণের বিধান ৫২
হায়েয-নিফাস অবস্থায় দোয়া-দুরুদ পাঠ করার বিধান ৫৩
স্বামীর সাথে নির্জনবাসের বিধান ৫৩
মসজিদে প্রবেশের বিধান ৫৬
হায়েয-নিফাস অবস্থায় ইতেকাফের বিধান ৫৭
হজ্জে গমনের বিধি-বিধান ৫৭

বিষয় পৃষ্ঠা

হায়েয-নিফাস অবস্থায় যে সমস্ত কাজ করা যায় ৫৯
হায়েয-নিফাস বন্ধ হওয়ার বিধান ৬২
ফরজ গোসলের বিবরণ ৬৩
হায়েয চলাকালে যৌনি পথে ন্যাপকিন বা তুলা ব্যবহার করার বিধান ৬৬
পরিণত বয়সের হায়েয বালেগ হওয়ার প্রমাণ বহন করে ৬৭
তালাকের বিধান ৬৮
ইদ্দত পালনের বিধান ৬৯
ইস্‌তেহাযগ্রস্ত মহিলাদের বিধি-বিধান ৭০
ওজর প্রমাণিত হওয়া ও অব্যাহত থাকার শর্তসমূহ ৭২
অস্বাভাবিক ইস্‌তেহাযার বিবরণ ও তাতে নামায রোজা ইত্যাদির বিধান ৭৪
মুবতাদিয়া মহিলার বিধান ৭৪
মু'তাদা বা অভ্যাসবিশিষ্ট মহিলার বিধান ৭৫
মুতাহায়্যিরাহ তথা হাযেয-অনহায়েযে দ্বিধাগ্রস্ত মহিলাদের বিধান ৭৬
মুতাহায়্যিরা মহিলার কুরআন তেলাওয়াত ও স্পর্শ করার বিধান ৭৮
মুতাহায়্যিরা মহিলার রোজা রাখার বিধান ৭৮
মুতাহায়্যিরা মহিলার হজ্জ পালনের বিধান ৭৯
মুতাহায়্যিরা মহিলার সাথে সহবাসের বিধান ৭৯
অনিয়ম ইস্‌তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণের ইদ্দতে পালনের বিধান ৮০
সাদা স্রাব ও লিকুরিয়ার বিধান ৮০
পবিত্রতা অস্বাভাবিক লম্বা হতে থাকলে তখন
যেভাবে দিন গুজরান ও ইবাদাত-বন্দেগী করবে ৮১

পরিশিষ্ট ৮৩
বিবাহ-বিচ্ছেদে ইসলামী বিধান ৮৯
তালাকের প্রকারভেদ ৯৩
পদ্ধতিগতভাবে তালাক তিন প্রকার ৯৩
১। 'আহসান তালাক' তথা সর্বোত্তম পদ্ধতি ৯৩
২। 'হাসান তালাক' তথা উত্তম পদ্ধতি ৯৩
৩। বিদাআত তালাক ৯৩
এক সাথে তিন তালাক দেয়ার হুকুম ৯৪
তালাক সংক্রান্ত জরুরী কিছু মাসআলা ৯৪
গ্রন্থপঞ্জী ৯৬

ভূমিকা

হায়েয-নিফাস শব্দদ্বয় অনেকের নিকট পরিচিত। তবে হাদীস ও ফিকহের কিতাবাদিতে হায়েয-নিফাসের পাশাপাশি ইস্‌তেহাযা নামে আরেকটি শব্দ পাওয়া যায়, যার সম্পর্কে আমাদের সমাজের অনেকে অনবগত।

ইস্‌তেহাযা হল হায়েয-নিফাস ভিন্ন এক অস্বাভাবিক স্রাব; যা রোগের কারণে মহিলাদের যৌনি পথে প্রকাশ পেয়ে থাকে। বক্ষমান পুস্তিকাটিতে "হায়েয-নিফাস ও ইস্‌তেহাযা" এ তিনটি বিষয়ে দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

প্রথম অধ্যায়ে, হায়েয-নিফাসের সংজ্ঞা ও শর্ত-শরায়েত নিয়ে আলোকপাত করা হবে এবং মহিলাদের জীবনে যে ধারাবাহিকতায় হায়েয-নিফাস এসে থাকে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং তারা "যে স্রাবের শিকার হয়" তা কখন হায়েয বলে গণ্য হয়, আর কখন নিফাস বলে গণ্য হয়, আর কখন ইস্‌তেহাযা বলে গণ্য হয়, তা নির্ণয় করা হবে।

আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে হায়েয-নিফাসের বিধি-বিধান নিয়ে আলোকপাত করা হবে এবং ইসতেহাযার বিধান আলোচনা করা হবে। অস্বাভাবিক ইসতেহাযায় মেয়েরা কিভাবে ইবাদাত-বন্দেগী করবে, দিন গুজরান করবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে।

প্রথম অধ্যায়

হায়েযের (মাসিক বা ঋতু স্রাবের) সংজ্ঞা

মহিলাদের যোনি পথে, নির্দিষ্ট বয়সে, বাচ্চা প্রসব ব্যতীত এবং গর্ভাশয়ে গর্ভ স্থির না হওয়া অবস্থায়, জরায়ু থেকে যে স্রাব প্রকাশ পায় তাকে হায়েয বলা হয়। যা আমাদের সমাজে মাসিক বা ঋতুস্রাব নামে পরিচিত। যাকে ইংরেজিতে mens বলা হয়। এ নামেও তাকে আমাদের শিক্ষিত সমাজ চিনে থাকে। (বাদায়েউসানায়ে খ. ১, পৃ. ১৫২, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ২৮৩)

হায়েযের (মাসিকের) রোকন ও শর্তসমূহ

হায়েয প্রমাণিত হওয়ার জন্যে প্রধান বিষয় তথা রোকন হল, যৌনি পথে স্রাব প্রকাশ পাওয়া। অতএব স্রাব চালু হওয়া ব্যতীত কোন মহিলা হায়েযগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে না।

আর স্রাব প্রকাশ পাওয়ার মানে হলো, যোনি নালি থেকে স্রাব নির্গত হয়ে বাকেরা "তথা কুমারী মেয়েদের যোনি পথে অবস্থিত সূক্ষ্ম পর্দা" এর স্থান অতিক্রম করে যোনি পথের দোপাটের ভিতরাংশে চলে আসা। এ পর্যন্ত আসার দ্বারা মহিলাদের স্রাব চালু হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। তারা হায়েযগ্রস্ত (মাসিক গ্রস্ত) বলে বিবেচিত এবং নিফাসগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। ইসতেহাযাগ্রস্ত বলে গণ্য হবে।

এ ব্যাপারে হযরত আশেয়া রা. উক্তি উল্লেখই মোনাসেব। তিনি বলেন :

كُنَّا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا نَتَكَلَّفُ اِلَّا بِالْمَسِّ۔

অর্থ : স্রাব চালু হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তেমন কসরত করতে যেতাম না। বরং শুধু স্পর্শ করে দেখতাম।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, লজ্জাস্থানে হাত রেখে তারা দেখতেন, স্রাব চালু হয়েছে কিনা? হাতে স্রাবের চিহ্ন দেখলে মনে করতেন স্রাব চালু হয়েছে। অন্যথায় চালু হয়নি। স্রাব নির্ণয়ের জন্যে খুব কসরত করতে না। যোনিপথের ভিতরাংশে আঙ্গুল দেয়া বা ভিতরাংশে তাকানো ইত্যাদি কসরত করতে যেতেন না।

অতএব মহিলাদের হায়েয অথবা নিফাসের স্রাব জরায়ু থেকে নির্গত হয়ে উক্ত সীমা পর্যন্ত আসার পূর্বেই ঔষধ খেয়ে বন্ধ করে দিলে অথবা তুলা ইত্যাদি ভিতরাংশে রাখার কারণে এ সীমা অতিক্রম করতে না পারলে, তখন মহিলাগণ হায়েযগ্রস্ত বা নিফাসগ্রস্ত সাব্যস্ত হবে না।

অবশ্য তুলা যখন বের করবে তখন থেকে হায়েয বা নিফাসগ্রস্ত বলে প্রমাণিত হবে।

উপরন্তু তুলা ইত্যাদি দিয়ে রাখলে পরে স্রাব যদি তুলায় ইত্যাদি মধ্যস্থতায় উক্ত সীমা পেরিয়ে আরো নিচে নেমে আসে, অথবা তুলা ইত্যাদি উক্ত সীমার নিচে রাখা থাকে, আর স্রাব ঐ তুলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন এ ধরনের মহিলা হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। তুলা রাখার সময় থেকেই হায়েয বা নিফাসগ্রস্ত বলে গণ্য হবে।

(আদ-দুররুল মুখতার ও শামী, ১, পৃ. ২৮৪, ফাতহুল কদীর, ১, পৃ. ১৬৩ পৃ.)

কিন্তু যে কোন রক্ত দেখা গেলেই তা হায়েয বলে গণ্য হবে, বিষয়টি এমনও নয়। বরং হায়েয (মাসিক) বলে গণ্য হওয়ার জন্যে কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

যেমন একটি শর্ত হল : ৯ বছর বা ততধিক বয়সে স্রাব আসা। অতএব এবয়সের পূর্বে মহিলাদের স্রাব পরিলক্ষিত হলে তা হায়েয বলে বিবেচিত হবে না। বরং তা ইস্‌তেহাযা বলে পরিগণিত হবে। (ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ৬৩, আদদুররুল মুখতার ও শামিয়া খ. ১, পৃ. ২৮৪, বাদায়ে খ. ১, পৃ. ১৫৭)

আরেকটি শর্ত হল : স্রাব শুরু হওয়ার পর কমপক্ষে তিনদিন পর্যন্ত চালু থাকা এবং দশদিনের অতিরিক্ত না হওয়া। তিনদিন থেকে দশদিন হল হায়েযের মেয়াদ। কাজেই এর মধ্যে যে স্রাব আসে তা হায়েয। আর যদি স্রাব শুরু হয়ে তিন দিনের আগে শেষ হয়ে যায়, তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে না। বরং তা ইস্‌তেহাযা বলে বিবেচিত হবে। এমনিভাবে দশ দিনের অতিরিক্ত স্রাবও হায়েয নয়। বরং তা ইস্‌তেহাযার স্রাব। (প্রাগুক্ত, হেদায়া, ১, পৃ. ১৬৩)

আরেকটি শর্ত হল : এক হায়েয অতিক্রান্ত হয়ে, আরেক হায়েয শুরু হওয়ার পূর্বে ১৫ দিন বা ততধিক দিনের একটি পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা অন্তর্বর্তী হওয়া। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় তুহুর বলা হয়। যদি এ তুহুর (পবিত্র সময়টি) ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই পুনরায় স্রাব শুরু হয়ে যায়, তাহলে ঐ স্রাব হায়েয ইস্‌তেহাযা বলে গণ্য হবে। (শামিয়া, আদদুররুল মুখতার : খ. ১, পৃ. ২৮৫, ইনায়া, খ. ১, পৃ. ১৬৩,)

আরেকটি শর্ত হল : মহিলাদের পেটে কোন ভ্রূণ না থাকা। সাধারণত মেয়েদের পেটে ভ্রূণ থাকলে, তথা গর্ভস্থির হয়ে গেলে, স্রাব আসে না। এটাই

সুস্থ-সবল মহিলাদের সাধারণ রীতি। কিন্তু এরপরও অনেকের রোগের কারণে এসময় স্রাব চালু হয়ে যায়। এ ধরনের স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে না, বরং তা ইস্‌তেহাযা বলে গণ্য হবে।

(আদ্‌দুররুল মুখতার : খ. ১, পৃ. ২৮৫, ইনায়া, খ. ১, পৃ. ১৬৩)

তবে একটি বিষয় এখানে ভালোভাবে বুঝতে হবে, অনেক মহিলাদের গর্ভস্থির হওয়ার পর তা ছুটে যায় এবং যৌনি পথে বাচ্চার পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ শেকেল ও সুরত অথবা কোন অঙ্গ প্রকাশ পাওয়া ব্যতীত স্রাব চালু হয়ে যায়। এ ধরনের স্রাব পূর্বোক্ত শর্তসাপেক্ষে হায়েয বলে বিবেচিত হবে।

আর বাচ্চার পূর্ণাঙ্গ অথবা অপূর্ণাঙ্গ শেকেল ও সুরত অথবা কোন অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার পর, স্রাব চালু হলে, তা নিফাসের (প্রসব পরবর্তী স্রাবের) শর্তসাপেক্ষে, নিফাস বলে বিবেচিত হবে।

(বাদায়ে খ. ১, পৃ. ১৬১, শরহে বেকায়া : খ. ১, পৃ. ১২১)

আরেকটি শর্ত হল, বাচ্চা প্রসব না হওয়া। কেননা বাচ্চা প্রসবের পর যে স্রাব প্রকাশ পায় তা হায়েয নয়, বরং তা নিফাস। (শরহে বেকায়া : খ. ১, পৃ. ১০৮)

পূর্বোক্ত আলোচনায় হায়েযের শর্তগুলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে এসে গেছে। যে স্রাবে এশর্তগুলো পাওয়া যাবে, তাই হায়েয বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু মহিলাদের স্রাবে যেহেতু বিভিন্নতার অভাব নেই, রূপান্তরের শেষ নেই, তাই কোন সময় শর্তগুলো পাওয়া যায়, আর কোন সময় পাওয়া যায় না, তা নির্ণয় করা বড় দুষ্কর। নির্ণয় করতে গিয়ে অনেকে ভুলের শিকার হয়।

কাজেই যে গতিবিধি ও ধারাতে মহিলাদের জীন্দেগীতে স্রাব এসে থাকে, সে গতিবিধি ও ধারাতে আলোকপাত করে যাবো। আর কোনসময় তা হায়েয বলে গণ্য হয়, আর কোন সময় নিফাস বলে গণ্য হয়, আর কোন সময় তা ইস্‌তেহাযা বলে পরিগণিত হয়, তা নির্ণয় করে যাবো। যাতে সর্বস্তরের লোকদের জন্যে তা অতি সহজ হয়ে যায়। তারা সরলভাবে বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

হায়েযের (মাসিক বা ঋতুস্রাবের) সূচনা

সুস্থ সবল মহিলাদের স্রাব ৯ বা ততধিক বয়সে শুরু হয়ে থাকে। এর আগে সাধারণত শুরু হয় না। এ বয়সে যে স্রাব আসে তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য স্রাব। শরীয়ত তাকে হায়েয বলে গণ্য করে। (আদ্‌দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার : খ. ১, পৃ. ২৮৪, ফাতহুল কদীর : খ. ১, পৃ. ১৬৩)

কিন্তু কিছু কিছু মহিলাদের স্রাব এর আগেও শুরু হয়ে থাকে। এ ধরনের মহিলাদের "স্রাব" অস্বাভাবিক স্রাব। এ স্রাব হায়েয নয়, ইসতেহাযার (রোগের) স্রাব। কেননা ৯ বছর বয়সে স্রাব আসার শর্ত এক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

স্রাব তিনদিন পর্যন্ত প্রলম্বিত হলে হায়েয, নতুবা ইস্‌তেহাযা

মহিলাদের স্রাব শুরু হয়ে তিনদিন অতিক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঐ স্রাব দুটি সম্ভাবনার মুখে থাকে। হায়েয হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আবার না হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তিনদিন বা ততধিক সময় ব্যাপী স্রাব চলমান থাকলে, তা হায়েয বলে গণ্য হবে। আর তিনদিনের আগে বন্ধ হয়ে গেলে তা হায়েয (মাসিক) বলে গণ্য হবে না। ইস্‌তেহাযা (রোগের স্রাব) বলে বিবেচিত হবে। (আদদুররুল মুখতার ও শামী খ. ১, পৃ. ২৮৪, বুখারী হাদীস নং ৩২১, মুসলিম হাদীস নং ৩৩৫, আবু দাউদ হাদীস নং ২৬৩ ও তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ)

স্রাব তিনদিন প্রলম্বিত হওয়ার আগ পর্যন্ত হায়েযগ্রস্তদের মতই আমল করে যাবে

এদোটানা সম্ভাবনার মাঝে মহিলাগণ নামায-রোজা ছেড়ে দিবে এবং স্বামীর সাথে সহবাস করা থেকেও বিরত থাকবে। অর্থাৎ সতর্কতাবশত হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের মত আমল করে যাবে। কেননা হায়েযের সময় রোজা-নামায ইত্যাদি নিষিদ্ধ। আর এক্ষেত্রে স্রাব চালু থাকার কারণে তা হায়েযে পরিগণিত হওয়ার দিকটিই প্রবল। (শামিয়া : খ. ১, পৃ. ৩০১, আদদুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৮৪)

এভাবে জিন্দেগী গুজরান করতে থাকবে। যদি তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে স্রাব চলতে থাকে, তাহলে তো পূর্বের দিনগুলোর স্রাবও হায়েয বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর হায়েয অবস্থায় রোযা-নামায করতে নেই। আর সে করেওনি। অতএব অবস্থা ও আমল মিলে গেছে, তাই কোনো ঝামেলা নেই।

আর যদি তিনদিন অতিক্রান্ত না হয়। অর্থাৎ তিন দিনের আগে শেষ হয়ে যায় তাহলে ঐ স্রাবের দিনগুলোর "স্রাব" হায়েয নয় বলে গণ্য হবে। বরং ইস্‌তেহাযার স্রাব বলে পরিগণিত হবে। তাই ছেড়ে দেয়া নামায ও রোজাগুলো কাযা করে নিতে হবে। (আদদুররুল মুখতার : খ. ১, পৃ. ২৮৪)

হায়েয (মাসিক) সাব্যস্ত হওয়ার পর দশদিন পর্যন্ত যে স্রাব আসে তা হায়েয, এর অতিরিক্ত স্রাব হায়েয নয়, ইস্‌তেহাযা

স্রাব শুরু হওয়ার পর অব্যাহত থেকে তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে যখন তা হায়েয (মাসিক) সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন থেকে মহিলাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তা কখন, কোন তারিখে বন্ধ হয়।

এক্ষেত্রে অধিকাংশ মহিলাদের স্রাব তিনদিন থেকে দশ দিনের মধ্যে কোন এক দিনে বন্ধ হয়ে থাকে। যেমন কারো ৬ দিনে আবার কারো ৮ দিনে বন্ধ হয়। যে মহিলার স্রাব যে তারিখে শেষ হয় তা ঐ মহিলার হায়েযের দিন ও মেয়াদ বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু কিছু কিছু মহিলাদের স্রাব চলতেই থাকে। দশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যায় অথচ স্রাব চলমান থাকে। ১২ বা ১৪ অথবা ততধিক দিনে স্রাব বন্ধ হয়। এ ধরনের সূচনাস্রাব বিশিষ্ট মহিলাদের ১০ দিন অতিরিক্ত স্রাব হায়েয (মাসিক) বলে গণ্য হবে না বরং তা ইস্‌তেহাযা (রোগের স্রাব) বলে গণ্য হবে। কেননা শরীয়তে হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে ১০ দিন। (দুররুল মুখতার : খ. ১, পৃ. ২৮৪)

দু'হায়েযের (মাসিকের) মাঝে অন্তর্বর্তী পবিত্রতার বিবরণ

মহিলাদের হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কিছু দিন পর্যন্ত স্রাবহীন যমানা অতিক্রান্ত হয়। যাকে তুহুর বলা হয়। বর্তমানে উদাসীন সমাজের সামান্য কিছু মানুষ স্রাব চলাকালীন দিনগুলোর প্রতি কিছুটা লক্ষ্য রাখলেও পবিত্রতার দিনগুলোর প্রতি তেমন একটা ভ্রূক্ষেপ করে না। হায়েয গেল কতদিন হল, আর কতদিন ব্যাপী পবিত্রতা স্থায়ী হল, তা কিছুই খেয়াল রাখে না। অথচ এগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক।

হায়েয পরবর্তী এ পবিত্র সময় চলতে থাকে, লম্বা হতে থাকে। এভাবে দীর্ঘ হতে হতে ১৫ বা দিন ততধিক সময় ব্যাপী প্রলম্বিত হয়। অনেকের ক্ষেত্রে তা ১ মাস অথবা দু'মাস এমনকি ১ বছর বা দু'বছর অথবা ততধিক সময় ব্যাপী দীর্ঘ হয়। তা যত দীর্ঘই হোকনা কেন তা শরয়ী পবিত্রতা বলে গণ্য হবে। তবে ১৫-২০ দিনের পবিত্রতা গুজরানের পর সাধারণত মহিলাদের নতুন স্রাব এসে থাকে। এনতুন স্রাবে যদি হায়েযের অন্যান্য শর্ত-শরায়েত পাওয়া যায়, তাহলে ঐ স্রাব হায়েয (মাসিক) বলে গণ্য হবে।

উপরন্তু কিছু কিছু মহিলাদের পবিত্রাবস্থা ১৫ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ হয় না। বরং ১৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই স্রাব শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ঐ মহিলার নবাগত স্রাব হায়েয বলে বিবেচিত হবে না। বরং তা ইস্‌তেহাযা বলে বিবেচিত হবে। কেননা হায়েযের পূর্বে ১৫ দিন বা ততধিক সময় পবিত্রতা প্রলম্বিত হওয়ার শর্ত এ ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়। (দুররুল মুখতার : খ. ১, পৃ. ২৮৪)

তবে এক হায়েযের পর আরেক হায়েয শুরু হওয়ার পূর্বে ১৫ দিন বা ততধিক সময় ব্যাপী পবিত্রতা-তুহুর অন্তর্বর্তী হওয়ার বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অর্থাৎ পবিত্রতার এ মেয়াদে কোন ধরনের স্রাব থাকবে না, স্রাব থাকলে তা পবিত্রতার মাঝে গণ্য হবে না, বিষয়টি এমন নয়। বরং পবিত্রতার

মেয়াদের মাঝেও কোনো কোনো সময় স্রাব চালু হয়ে যায়। যা ইস্‌তেহাযার স্রাব বলে বিবেচিত হবে। এসময়গুলোও হুকুমের বিবেচনায় পরিত্রতার মেয়াদের মধ্যে গণ্য হবে।

যেমন কারো হায়েযের মেয়াদ তথা ১০ দিন পার হওয়ার পরও দুদিন ইস্‌তেহাযার স্রাব চালু ছিল। অতঃপর পবিত্রতা ১৫ দিন স্থায়ী হয়নি বরং তের দিন স্রাবহীনতা অতিবাহিত হওয়ার পর, পুনরায় স্রাব চালু হয়ে গেল। এক্ষেত্রে হায়েয পরবর্তী ইস্‌তেহাযার দুদিনসহ পবিত্র ১৩ দিনকে পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য পবিত্রতা হিসাবে গণ্য করা হবে। কাজেই ১৩ দিন পর নবাগত স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে।

এমনকি আদত বিশিষ্ট (আদত কাকে বলে তার বিবরণ সামনে আসছে) মহিলার যদি আদত পার হয়ে আরো দু'এক দিন স্রাব চলার পর দশ দিনের পূর্বে বন্ধ হয়। এমনিভাবে যাদের আদত নেই বরং একেকটি হায়েয একে রকম আসে, তাদের চলমান স্রাব যদি আগের হায়েযের মেয়াদ অতিক্রম করে দু'একদিন চলার পর দশ দিনের মধ্যেও বন্ধ হয়। অতঃপর পবিত্রতা শুরু হয়ে তা ১৫ দিন ব্যাপী প্রলম্বিত হওয়ার পূর্বেই ১৩ দিনের মাথায় বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে আগের হায়েযের (মাসিকের) নিসাব ও আদত অতিরিক্ত স্রাব, ইস্‌তেহাযা স্রাবে পরিগণিত হয়ে যাবে এবং পবিত্র সময় সাথে যোগ হয়ে যাবে। পবিত্রতার দিনগুলোর সাথে এগুলো যোগ হয়ে ১৫ দিনের পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা ও শরীয়তে গ্রহণযোগ্য পবিত্রতা বলে পরিগণিত হয়ে যাবে। ফলে এ ধরনের পবিত্রতার পরবর্তী স্রাব হায়েয বলে পরিগণিত হবে। (আদদুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ৩০১)

এতো হল পূর্ণাঙ্গ ও শরয়ীতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য পবিত্রতার বিবরণ। কিন্তু এ পবিত্রতা ছাড়াও আরেক ধরনের পবিত্রতা রয়েছে যা অপূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা। অপূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা ও তার মাঝে দেখা যাওয়া স্রাবের হুকুম নির্ণয় করতে গিয়ে অনেকে বিপাকে পড়ে থাকে। তাই তা ভালভাবে বুঝে নেয়া সকলের জন্যে আবশ্যক।

অপূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা ও তার ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পাওয়া স্রাবের বিবরণ

সুস্থ মহিলাদের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক রীতি। হায়েযের মাঝে পনের দিন ঊর্ধ্ব একটি পবিত্রতা অতিক্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে অনেক মহিলাদের পবিত্রতা পনের দিন স্থায়ী হয় না। বরং হায়েয বন্ধ হয়ে ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই পুনরায় স্রাব দেখা দেয়।

এ ধরনের মহিলাগণ অসুস্থ মহিলা। এ অসুস্থতার মাত্রা যে মহিলার মাঝে যত বেশী হয়, তার পবিত্রতার মুহূর্ত তত কমে যায়। এমনকি অনেক মহিলার ক্ষেত্রে তো এমন হয় যে তাদের পাবিত্রতাই বাকি থাকে না। বরং অনবরত স্রাব চালু হয়ে যায়। এ ধরনের অনবরত রোগগ্রস্ত স্রাববিশিষ্ট মহিলার বিধি-বিধান দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

কিন্তু সমস্যা হল যাদের রোগা হালকা, অর্থাৎ পবিত্রতা আসে কিন্তু পনের দিন স্থায়ী হয় না। এমন মহিলাদের বিধান নির্ণয় করতে গিয়ে অনেকে বিপাকে পড়েন। আর এ সমস্যাগুলো এখন ব্যাপক। দেখা যায়, কোন মহিলা মাত্র এক ঘণ্টা স্রাব আসে। অতঃপর এক দিন পবিত্র থাকে। অথবা দুএকদিন স্রাব থাকে। আবার পাঁচ-সাত পবিত্র দিন থাকে। এভাবে অনিয়মভাবে চলতে থাকে। এমনকি অনেকের দু'এক ফোঁটা স্রাব আসে, অতঃপর তা বন্ধ হয়ে যায়। আবার পাঁচ সাতদিন পর দু এক ফোঁটা আসে।

এভাবে বিভিন্ন অনিয়ম হয় পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের অনিয়ম অনেক মহিলার জীবন্দেগীতে লেগে থাকে। এ গতিতে জীন্দেগী কাটতে থাকে। আবার অনেকের সব সময় লেগে থাকে না, তবে মাঝে মধ্যেই এমনটি হয়ে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন ঔষধ সেবনের ফলে এ ব্যতিক্রমটি অধিকহারে আমাদের নারী সমাজের মাঝে পলিক্ষিত হয়ে থাকে।

হুকুমের বিবেচনায় ১৫ দিন অনূর্ধ্ব পবিত্রতা গ্রহণযোগ্য পবিত্রতা নয়। কেননা ১৫ দিনের ভিতরে দুদিকে স্রাব থাকলে, গোটা ১৫ দিনে অনবরত স্রাব চলমান ছিল বলে গণ্য করা হয়।

(শামিয়া : খ. ১, পৃ. ৪৮৩, যাকারিয়া, বাদায়ে : খ. ১, পৃ. ১৬০ যাকারিয়া)

তাই এ ধরনের অনিয়ম স্রাব ও অপূর্ণাঙ্গ পবিত্রতাগ্রস্ত মহিলাগণ যেদিন প্রথম স্রাব দেখতে পাবে ঐ দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত হায়েযগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে। আর বিশদিন অনহায়েযগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে। আর ঐ বিশ দিনের মাঝে যে বিচ্ছিন্ন স্রাবগুলো দেখা যাবে, তা রোগের স্রাব বা ইসতেহাযার স্রাব বলে বিবেচিত হবে।

এ তো হলো সূচনা স্রাব বিশিষ্ট মহিলার বিধান। আর যদি আদতবিশিষ্ট (আদতের আলোচনা সামনের শিরোনামে আসছে) মহিলা হয়, আর তার আদতের তারিখে স্রাব চালু হয়ে কিছু সময় বা দু একদিন চলমান থেকে বন্ধ হয়ে যায়, অতঃপর ১৪ বা ১৫ তারিখের মাঝে পুনরায় স্রাব দেখা দেয়, তাহলে

তার আদত যে কয়দিন ছিল ঐ কয়দিন হায়েযের দিন বলে গণ্য হবে। বাকি দিনগুলো অনহায়েযের দিন বলে গণ্য হবে। (প্রাগুক্ত)

আর যদি আদতে তারিখের পূর্বেই স্রাব দেখা দেয় অতঃপর ১৫ তারিখের মাঝেই পুনরায় স্রাব দেখা দেয়, আর গোটা আদত-অভ্যাসের মেয়াদ খালি অবস্থায় কাটে, তাহলেও পূর্বোআদতের দিনগুলোই হায়েয বলে গণ্য। আগে-পরের কোন স্রাবই হায়েয বলে গণ্য হবে না। বরং ইস্তেহাযার স্রাব বলে বিবেচিত হবে। (প্রাগুক্ত)

১৫ দিনের অনূর্ধ্ব পবিত্রতা এবং অনিয়ম স্রাবের পরিক্রমার মাঝে কোন এক পর্যায়ে পূর্ণ একটি পবিত্রতা পরিলক্ষিত হওয়ার পর পুনরায় স্রাব ও পবিত্রতা অনিয়মভাবে চলতে থাকলে, এমনিভাবে পূর্ণ একটি ১৫ দিনের পবিত্রতা এবং একটি হায়েয দেখতে পাওয়ার পর পুনরায় অনিয়ম স্রাব ও অপূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা চলতে থাকলে তাদের হুকুম পবির্তন হয়ে যাবে। যেমনটি অনবরত ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের বিধি-বিধানে আলোচনা করা হবে।

সারকথা হলো, এ ধরনের মহিলাগণও হুকুমের দিক থেকে অনবরত ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা। বিধি-বিধানের আলোচনায় অনবরত ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে। তা এসকল মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই সে আলোচনার আলোকে এ ধরনের মহিলাদের হুকুম আরো সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

হায়েয (মাসিক বা ঋতুস্রাব) ও পবিত্রতায় সাধারণ আদত ও নিয়ম

এভাবে পবিত্রতার দিনগুলো পার হয়ে পুনরায় স্রাব শুরু হলে অধিকাংশ মহিলাদের স্রাব তাদের প্রথম হায়েয মুতাবেক এসে থাকে। অর্থাৎ প্রথম হায়েয ৫ দিন হয়ে থাকলে দ্বিতীয়, তৃতীয় হায়েযও ৫ দিন এসে থাকে। আর ৭ দিন এসে থাকলে দ্বিতীয় তৃতীয় হায়েযও ৭ দিন এসে থাকে। আর দশ দিন এসে থাকলে দ্বিতীয় তৃতীয় হায়েযও ১০ দিন এসে থাকে। এমনিভাবে পরবর্তী হায়েযগুলোও একি ধারায় এসে থাকে। এ ধরনের মহিলাদেরকে আদত ও অভ্যাস বিশিষ্ট মহিলা বলা হয়।

এমনিভাবে পূর্বে হায়েয যদি মাসের শুরুর দিকে এসে থাকে, পরবর্তী হায়েযগুলো শুরুর দিকে এসে থাকে, মাসের মাঝখানে অথবা শেষে এসে থাকলে, পরবর্তীগুলো মাঝে অথবা শেষে এসে থাকে।

হায়েয-অন্তবর্তী পবিত্রতার মেয়াদগুলোর ক্ষেত্রেও এমনটিই হয়ে থাকে। তা প্রথম ধারায়ই চলতে থাকে। যাদের হায়েয ও পবিত্রতা একটা নিয়মে ও ধারায়

চলতে থাকে, তাদের হায়েয সংক্রান্ত বিধিবিধানে তেমন জটিলতা নেই। সহজে তা আয়ত্ত করা সম্ভব হয়।

কিন্তু কিছু কিছু মহিলাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। যেমন হায়েযে অনিয়ম হয়, তেমন পবিত্রতায়ও হয়। হায়েযে অনিয়ম হয় এভাবে যে, প্রথম হায়েযের মেয়াদ পরবর্তী হায়েযগুলোতে ঠিক থাকে না। কারো প্রথম কয়েক হায়েয ঠিক থাকলেও পরবর্তীগুলো ঠিক থাকে না।

আবার অনেকের এক হায়েয আরেক হায়েয থেকে দু'একদিন কম হয়। অথবা পরবর্তী হায়েয দু একদিন বেশী হয়। এভাবে দু'এক দিনের কম-বেশীর তারতম্যে পালাক্রমে চলতে থাকে। এভাবে পূর্বের হায়েয মাসের শুরুর দিকে এসে থাকলে এখন শেষের দিকে এসে থাকে। অথবা শেষে এসে থাকলে এখন শুরুর দিকে এসে থাকে, এ ধরনের বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের মহিলাদেরকে আদত অনিয়ম বলে আমরা ব্যক্ত করব।

আদত-অভ্যাস অতিরিক্ত স্রাব-নির্ণয় মূলনীতি

যদি আদত বিশিষ্ট মহিলার স্রাব আদত মোতাবেক বন্ধ হয়, আর আদত অনিয়ম মহিলার স্রাব, আগের হায়েযের মেয়াদ অনুযায়ী বন্ধ হয়, তাহলে স্রাব যে কয়দিন চলমান ছিল, ঐ কয়দিনই হায়েয। আর যদি আগের হায়েযের মেয়াদ ও আদত অতিক্রম করে স্রাব চলতে থাকে, তাহলে দেখতে হবে তা কতদিনে বন্ধ হয়। যদি দশ দিনের ভিতরে বন্ধ হয়, তাহলে পুরো স্রাবই হায়েয বলে পরিগণিত হবে। আর এর দ্বারা আদতবিশিষ্ট মহিলার অভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে বলে ঠাওরাবে।

আর আমরা পূর্বে পবিত্রতার আলোচনায় বলে এসেছি যে, আগের হায়েয ও পূর্বো আদতের অতিরিক্ত স্রাব দশ দিনের ভিতরে বন্ধ হলে, তা ঐ সময় হায়েয বলে গণ্য হয়, যখন তারপর একটি পূর্ণাঙ্গ পবিত্র সময় অতিবাহিত হয়। আর যদি পূর্ণাঙ্গ ১৫ দিনের পবিত্রতা না যায়, বরং পবিত্রতা ১৫ দিনের এতটুকু কম সময় ব্যাপী হয়, যার সাথে পূর্বের আদত অতিরিক্ত স্রাবের সময় যোগ করলে পনের দিন পুরা হয়ে যায়, তাহলে ঐ আদত অতিরিক্ত স্রাবগুলো হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে না। বরং ইসতেহাযা বলে গণ্য হবে এবং পবিত্রতার দিনগুলোর সাথে তা যোগ করে পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা জ্ঞান করা হবে। যেমনটি উপরে বলে এসেছি।

তবে আদত অতিরিক্ত এবং আগের হায়েযের অতিরিক্ত দিনগুলো যখন কাটাতে যাবে, তখন সতর্কতাবশত হায়েগ্রস্তদের মত কাটাবে। যেমনটি 'আদত অতিরিক্ত স্রাবে রোযা-নামায' শিরোনামে সামনে আলোচনা করা হবে। আর

যখন অপূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা অতিবাহিত দ্বারা এ স্রাব ইস্‌তেহাযা বলে গণ্য হয়ে যাবে, তখন এদিনগুলোর রোযা-নামায কাযা করে নিতে হবে।

(দুররুল মুখতার : খ. ১, পৃ. ৩০১)

উপরন্তু যদি দশদিন অতিক্রম করে স্রাব চলতে থাকে, তাহলে যেসব মহিলাদের অভ্যাস বা আদত রয়েছে তাদের হায়েয নির্ণিত হবে পূর্ববর্তী আদত দ্বারা। অর্থাৎ চলতি স্রাবে আদত (সাধারণ রীতি) পর্যন্ত স্রাব হায়েয বলে পরিগণিত হবে। আর আদত অতিরিক্ত স্রাব হায়েযের মধ্যে পরিগণিত হবে না বরং তা ইস্‌তেহাযা বলে গণ্য হবে। (দুররুল মুখতার, শামী : খ. ১, পৃ. ২৮৫)

আর যদি অতিরিক্ত স্রাবের শিকার মহিলা আদত অনিয়ম মহিলা হয়, তাহলে চলতি হায়েয নির্ণিত হবে পূর্বের হায়েয দ্বারা। অর্থাৎ চলতি হায়েযের পূর্বের হায়েযে যে কয়দিন হায়েয এসেছিল, চলতি হায়েযেও ঐ কয়দিনের স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে। বাকি স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে না। বরং তা ইস্‌তেহাযা বলে গণ্য হবে। তাই পরবর্তীতে ঐ দিনগুলোর নামায-রোজা কাযা করে নিতে হবে। (শামিয়া, ১, পৃ. ৩০১, হিন্দিয়া ১, পৃ. ৩৭)

এমনিভাবে পূর্বো আদত ও পূর্বো হায়েযের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই যদি স্রাব তিনদিন পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ঐ স্রাব ও হায়েয বলে গণ্য হবে। আর যদি পরবর্তীতে হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদের ভিতরেও স্রাব ফিরে না আসে, তাহলে হায়েযের পূর্বো আদতে পরিবর্তন এসেছে বলে গণ্য হবে। হায়েযের দিন কমে গেছে বলে ধার্য হবে।

আদত অভ্যাস অতিরিক্ত স্রাবে রোজা নামায

আদত বিশিষ্ট ও আদত অনিয়ম মহিলার আদত ও আগের হায়েযের মেয়াদ অতিরিক্ত স্রাব "যেমন কারো হায়েয পাঁচ দিন আসত, কিন্তু কোন এক স্রাব পাঁচ দিনের গণ্ডি পেরিয়ে চলতে থাকলে" এ ধরনের সীমা অতিরিক্ত স্রাব ইস্‌তেহাযা না হায়েয? তা নির্ণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত যে দোদুল্যমান সময়কাটে, ঐ সময় ও দিনগুলোতে তারা নামায রোজার মধ্যে কাটাবে? নাকি হায়েযগ্রস্তদের মত তা থেকে বিরত থাকবে?

এ দোটানা, দোদুল্যমান সময়গুলোতে তারা হায়েযগ্রস্ত (মাসিকগ্রস্ত) মহিলাদের ন্যায় দিন গুজরান করবে। নামায-রোজা সহবাস ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকবে। আর অপেক্ষা করতে থাকবে কখন স্রাব বন্ধ হয়।

যদি দশ দিনের গণ্ডি পেরিয়েও স্রাব চলতে থাকে তখন গোসল করে নামায শুরু করে দিবে। আর পূর্বোআদতের মেয়াদ ও আদত অনিয়ম মহিলার পূর্বের হায়েয মেয়াদ অতিরিক্ত স্রাবের দিনগুলোর নামায-রোজা কাযা করে নিবে।

যেহেতু তা হায়েয ছিল না; বরং ইস্তেহাযা ছিল। যেমনটি পূর্বের শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে।

আর যদি দশ দিনের ভিতরেই কোন তারিখে অতিরিক্ত স্রাব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তারপর কতদিনের পবিত্রতা আসে তা খুব ভালভাবে লক্ষ্য করবে এবং সে পবিত্রতা দ্বারা এ অতিরিক্ত স্রাব হায়েয না ইস্তেহাযা, তা নির্ণয় করবে। (যেমনটি পূর্বের শিরোনামের অধীনে আলোকপাত করা হয়েছে) এবং সে অনুযায়ী আমল করবে। (শামী : খ. ১, পৃ. ৩০১)

হায়েযের (মাসিকের) আদতের পূর্বে বা পরে স্রাব দেখা দিলে তার বিধান

হায়েযের আদতে যে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়; তার মাঝে উল্লেখযোগ্য আরেকটি অনিয়ম হল, হায়েয আসার সাধারণ যেসময় রয়েছে, ঐ সময় মুতাবেক হায়েয না আসা। যেমন কারো হায়েয মাসের শুরুর দিকে আসত, অথবা শেষের দিকে আসত; কিন্তু কোন এক হায়েযে দেখা গেল সাধারণ সময়ের পূর্বে অথবা পরে স্রাব এসেছে। এ ধরনের অনিয়ম স্রাব হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে নাকি, ইস্তেহাযার মধ্যে গণ্য হবে? তা একটু বিস্তর আলোচনার বিষয়।

হায়েয আসার যে সাধারণ সময় রয়েছে তার পূর্বাপর স্রাব আসার ক্ষেত্রে কয়েকটি সুরত হতে পারে। হয়ত তিন দিন বা ততধিক সময়কাল স্রাব চালু থেকে হায়েযের সাধারণ সময়ের পূর্বে স্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। অথবা হায়েযের মেয়াদের পূর্বে, তিনদিন অথবা তার থেকে স্বল্প সময় ব্যাপী চালু থেকে হায়েযের মেয়াদেও তিনদিন বা ততধিক সময় ব্যাপী চালু থাকবে।

এমনিভাবে হায়েযের মেয়াদে স্রাব শুরু হয়ে, তিন দিন বা ততধিক সময় কাল স্রাব চলমান থেকে হায়েযের মেয়াদের পরও তিনদিনের কম অথবা বেশী সময় স্রাব চালু থেকে বন্ধ হবে। এমনিভাবে হায়েযের মেয়াদে কোন স্রাব না এসে হায়েযের মেয়াদ পার হওয়ার পর তিন দিন বা ততধিক দিন স্রাব এসে থাকবে।

এ ধরনের বিভিন্ন অনিয়ম দেখা যায়, এ অনিয়মগুলোকে মৌলিকভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। (১) হয়ত এ অনিয়ম স্রাব দশদিন অতিক্রম করে চলমান থাকবে। (২) অথবা থাকবে না। বরং দশ দিনে অথবা তার আগেই স্রাব বন্ধ হয়ে যাবে।

যদি দশ দিনে অথবা তার পূর্বে স্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পূর্বাপর পূর্ণাঙ্গ দুটি পবিত্রতা অতিক্রান্ত হয়, তাহলে ঐ স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে। চাই ঐ স্রাব হায়েয মেয়াদের পূর্বে আসুক অথবা পরে আসুক। অথবা হায়েযের

মেয়াদের মধ্যেই আসুক না কেন। সব সুরতে একি হুকুম এবং যে মহিলা এ ধরনের ব্যতিক্রম স্রাবের শিকার হয়, তার পূর্বো মেয়াদে পরিবর্তন এসেছে বলে বিবেচিত।

আর যদি এ ব্যতিক্রম সময়ের হায়েযের আগের হায়েযের দিন বহাল থাকে অর্থাৎ পূর্বে যে কয়দিন হায়েয আসত এ হায়েযেও ঐ কয়দিন হায়েয এসে থাকে, তাহলে পূর্বো হায়েযের দিন বহাল আসে বলে পরিগণিত হবে। শুধু হায়েয আসার সময়ে পরিবর্তন এসেছে বলে গণ্য হবে। আর যদি আগের হায়েযের দিনও এ হায়েযে ঠিক না থাকে, তাহলে হায়েযের দিনেও পরিবর্তন এসেছে বলে বিবেচিত হবে।

আর যদি এ ব্যতিক্রম সময়ের হায়েয দশ দিন অতিক্রম করে চলমান থাকে, অতঃপর বন্ধ হয়, তাহলে লক্ষ্য করতে হবে এ স্রাবের কোন অংশ হায়েযের মেয়াদের মধ্যে পড়েছে কিনা? এবং তা তিন দিনের সময় ব্যাপী চলমান ছিল কিনা?

যদি এমনই হয় অর্থাৎ ঐ স্রাবের শুরুর দিকের অথবা শেষের দিকের তিন দিন বা ততধিক দিনের স্রাব হায়েযের পূর্বো মেয়াদ অনুযায়ী এসে থাকে, তাহলে ঐ অনিয়ম স্রাবের এ স্রাবটুকু, যা আদতের মেয়াদের মধ্যে এসে থাকে; তা হায়েয বলে গণ্য হবে। আর বাকি স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে না। বরং তা ইস্‌তেহাযা বলে গণ্য হবে।

আর যদি হায়েয আসার মেয়াদের মধ্যে এতটুকু সময় ধরেও স্রাব না এসে থাকে। বরং এর চেয়েও কম এসে থাকে। যেমন শুধু দু'একদিনের স্রাব হায়েযের মেয়াদের মধ্যে পড়ে। তাহলে এ ধরনের ব্যতিক্রম স্রাবের মধ্যে হায়েয নির্ণিত হবে হায়েযের পূর্বো আদতের দিন দ্বারা। অর্থাৎ পূর্বে যে কয়দিন হায়েয আসত ঐ কয়দিনই এস্রাবে হায়েয বলে গণ্য হবে।

যেমন পূর্বে পাঁচ দিন যাবত হায়েয আসত, তাহলে এ স্রাবেরও পাঁচ দিন হায়েয বলে গণ্য হবে। পূর্বে সাত দিন এসে থাকলে, এস্রাবেরও সাত দিন হায়েয বলে গণ্য হবে। বাকি স্রাব ইস্‌তেহাযা বলে বিবেচিত হবে।

হায়েযের আদত ও মেয়াদের অনিয়ম তথা আগে পরে যে স্রাব আসে তাতে কিভাবে দিন কাটাবে?

এ ধরনের স্রাবে মহিলাগণ "আদত অতিরিক্ত স্রাবের শিকার মহিলাগণের" মতো নামায-রোজা সহবাস ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকবে। হায়েযগ্রস্তদের মত দিন কাটাবে। এভাবে দিনাতিপাত করতে করতে যে পর্যায়ে এসে প্রমাণিত হয়

যে, তার সদ্য চলমান স্রাব হায়েয নয় বরং ইস্‌তেহাযা। তখন থেকে রোজা নামায শুরু করে দিবে এবং ইস্‌তেহাযাগ্রস্তদের মতো আমল করে যাবে।

আর যে দিনগুলো হায়েযগ্রস্তদের মত কাটিয়েছে, ঐ দিনগুলোর যে পরিমাণ সময় হায়েয ছিল তাতে রোজা-নামায করার প্রয়োজন ছিল না, আর সে করেওনি। বাকি রোযাগুলো কাযা করে নিতে হবে। আর যে কয়দিন ইস্‌তেহাযা ছিল ঐ কয়দিনের নামায-রোজা রয়ে গেছে, তাই তা কাযা করে নিতে হবে।

(শামিয়া : খ. ১, পৃ. ৩০১, হিন্দিয়া খ. ১, পৃ. ৩৯, ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ২৮০)

হায়েযের ফাঁকে ফাঁকে স্রাবহীনতার অনুপ্রবেশ

আমরা ইতোপূর্বে কিছুটা বিশদভাবে আলোকপাত করা প্রয়াস পেয়েছি যে, মেয়েদের কিছুদিন পরপর কয়েকদিন ব্যাপী হায়েয এসে থাকে। তবে মেয়েদের হায়েযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একাধারে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্রাব চলমান থাকে, বিষয়টি এমন নয়। স্রাবের মাঝে মাঝে কিছু ফাঁকা সময়ও যায়। স্রাবহীন মুহূর্তও কাটে।

কারো এক ঘণ্টা, কারো দু'ঘণ্টা স্রাবহীনতায় কাটে। আবার কারো স্রাবহীনতা একদিন আবার কারো দু'দিন দীর্ঘ হয়। এমনকি কারো শুরু ও শেষে স্রাব থাকে, আর মাঝের পুরো সময় ব্যাপী স্রাবহীনতা প্রলম্বিত হয়।

(দুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৯০)

সাধারণত সূচনার দিনগুলোতে স্রাবহীন অবস্থা খুব একটা দীর্ঘ হয় না, বরং স্বল্প সময় ব্যাপী হয়ে থাকে। আর শেষের দিনগুলোতে স্রাবহীনতা একটু দীর্ঘ ও প্রলম্বিত হয়ে থাকে। আর যাদের একাধিক হায়েয অতিক্রান্ত হয়, তাদের এ স্রাবহীন মুহূর্তগুলোর ক্ষেত্রে এক ধরনের ধারণা হয়ে যায়, যে স্রাবের ফাঁকে ফাঁকে তাদের কতটুকু সময় স্রাবহীন অবস্থা যায়। এটা তাদের স্রাবহীনতার আদত ও অভ্যাস।

হায়েযের ফাঁকে ফাঁকে যে স্রাবহীনতা পরিলক্ষিত হয় তার হুকুম

হায়েযের ফাঁকে ফাঁকে যে স্রাবহীন মুহূর্তগুলো দেখা যায়, তা অল্প সময় ব্যাপী হয়ে থাকে আবার একটু দীর্ঘ সময় ব্যাপীও হয়ে থাকে। স্বল্প সময় ব্যাপী স্রাবহীন মুহূর্তগুলো নিয়ে তেমন ভাবতে হয় না, কারণ সহজেই অনুমান করা যায় যে, তা হায়েযের হুকুমে।

আর দীর্ঘ স্রাবহীন মুহূর্তগুলো একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অর্থাৎ স্রাবহীনতা যখন দীর্ঘ হতে থাকে তখন দেখতে হবে তা কখন শেষ হয়। যদি স্রাবহীনতা প্রলম্বিত হতে হতে দশ দিনের গণ্ডি পেরিয়ে যায় এবং পনের দিন পর স্রাব চালু

হয়, তাহলে এ ধরনের স্রাবহীনতা হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে না। আর শুরুতে যে স্রাব চালু ছিল তা যদি তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার পর, স্রাবহীনতার উদরে লীন হয়। তাহলে ঐ স্রাব হায়েয বলে পরিগণিত হবে। আর তিন দিনের কম সময় স্থায়ী হলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে না। ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে।

(আদদুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৯০, ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ১৭৩)

পক্ষান্তরে যদি স্রাবহীনতা পনের দিনের আওতায়, ১০ তারিখের ভিতরে লীন হয়ে যায় এবং স্রাব চালু হয়ে যায়। আর এ নবাগত স্রাব দশ দিনের অতিক্রম করে চলতে থাকে, তাহলে সূচনা স্রাব বিশিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে এ স্রাবহীনতা, হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে এবং নবাগত স্রাব থেকে দশ দিনের মেয়াদ পর্যন্ত স্রাব হায়েয বলে পরিগণিত হবে। বাকি স্রাব ইস্তেহাযা বলে পরিগণিত হবে।

আর আদত বিশিষ্ট ও আদত অনিয়ম মহিলার ক্ষেত্রে তার আদত ও আগের হায়েযের মেয়াদের আওতায় যতটুকু স্রাবহীনতা পড়ে তা হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে। আর আগের হায়েযের মেয়াদ ও আদত অতিরিক্ত স্রাবহীনতা ও স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে না।

যেমন কারো হায়েয আসার আদত ছিল ৫ দিন বা সাতদিন। বর্তমান স্রাব তিন দিন চালমান থেকে স্রাবহীনতা শুরু হয়ে পুনরায় আট তারিখে স্রাব শুরু হয়ে দশ দিনের সীমা অতিক্রম করে কোন এক তারিখে বন্ধ হয়। তাহলে এ স্রাবহীনতা, ৫ তারিখ বা ৭ তারিখ পর্যন্ত হায়েয বলে গণ্য হবে। বাকি স্রাবহীনতা ও স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে না। নবাগত স্রাব ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে। (দুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৮৫ ও ২৯০, ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ১৭৩)

এমনিভাবে যদি ১৫ দিনের আওতায় দশ তারিখের পর স্রাবহীনতার অবসান হয় এবং স্রাব চালু হয়, তাহলে সূচনা হায়েয বিশিষ্টদের দশ দিনের স্রাবহীনতা হায়েয বলে গণ্য হবে। আর আদতবিশিষ্ট মহিলার আদত পর্যন্ত স্রাবহীনতা হায়েয বলে গণ্য হবে।

এমনিভাবে স্রাবহীনতা যদি দশ দিনের পূর্বে অবসান হয়ে স্রাব চালু হয়ে পুনরায় দশ দিন বা তার পূর্বে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সূচনা বিশিষ্ট ও আদত বিশিষ্ট ও আদত অনিয়ম, তথা সকল ধরনের মহিলার স্রাবহীনতা হায়েযের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে এবং নবাগত স্রাব ও হায়েয বলে পরিগণিত হবে। আর এর দ্বারা আদত বিশিষ্ট মহিলার আদতে পরিবর্ত এসেছে বলে ঠাওরাবে। (আদদুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৮৫, ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ১৭৩)

হায়েযের ফাঁকে ফাঁকে যে স্রাবহীন মুহূর্তগুলো পরিলক্ষিত হয় তা কিভাবে কাটাবে?

অল্প সময়ে স্রাবহীন মুহূর্তগুলোতে হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের মত কাটাবে? না কি নামায রোজা শুরু করে দিবে? তা নিয়ে তেমন ভাবতে হয় না। কেননা স্বল্প সময়ের মধ্যে নামায-রোজা করা বা না করার মত দোটানা পরিস্থিতির শিকার হতে হয় না। বরং অল্প সময়ের ব্যবধানে স্রাবহীন মুহূর্তগুলো স্রাবের উদরে লীন হয়ে যায়। স্রাব দ্বারা বেষ্টিত হয়ে যায়।

আর দীর্ঘ ও লম্বা স্রাবহীন মুহূর্তগুলোর মধ্যে ইবাদাত বন্দেগী করা ও না করার মত দোটানা পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। কেননা পূর্ণরায় স্রাব আসার যেমন সম্ভাবনা রয়েছে, না আসারও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু স্রাবহীনতা প্রলম্বিত হতে থাকলে স্রাব না আসার বিষয়টি প্রধান্যতা লাভ করে, ফলে এ সময় নামায-রোজা শুরু করে দিতে হবে।

অতএব স্রাবহীনতা লম্বা ও দীর্ঘ হওয়ার আগ পর্যন্ত মহিলাগণ হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের মত দিনগুজরান করবে। নামায, রোজা ও সহবাস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু যখন স্রাবহীনতা অসাধারণভাবে দীর্ঘ হতে থাকে। তখন থেকে নামায শুরু করে দিবে। তবে সহবাস থেকে বিরত থাকবে।

স্রাবহীনতা দীর্ঘ হওয়ার যে সময়সীমা ফুকাহায়ে কেরাম নির্ধারণ করেছেন, তা হল : যে নামাযের ওয়াক্তে স্রাবহীনতা দেখা দেয়, ঐ নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব। এর মাঝেও যদি স্রাব ফিরে না আসে, তাহলে গোসল সম্পাদন করে নামায শুরু করে দিবে। রমজান মাস হলে এবং সুবহে সাদিকের সময়ে হলে রোজাও রাখতে হবে।

এতো হল ঐ স্রাবহীনতার হুকুম যা হায়েযগ্রস্ত মহিলাগণ অথবা নিফাসেগ্রস্ত মহিলাগণ, আপন হায়েয-নিফাসের অভ্যাস ও পূর্বোহায়েয-নিফাসের দিন তারিখের পূর্বে দেখতে পায়। পক্ষান্তরে যদি অভ্যাস ও পূর্বোহায়েযের দিন ও তারিখের পর স্রাবহীনতা দেখতে পায় তখন উপরোক্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। যদি অপেক্ষা না করে তার পূর্বেই নামায শুরু করে, তাতে গুনাহ হবে না। (শরহে বেকায়া, খ. ১, পৃ. ১১৮)

আর যদি হায়েয প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে যেমন স্রাব তিন দিন স্থায়ী হওয়ার পূর্বেই স্রাবহীনতা দেখা দেয়া। তখনও যে ওয়াক্তে স্রাবহীনতা দেখা দিয়ে থাকে ঐ ওয়াক্তের মুস্তহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব। এর মাঝে যদি স্রাব ফিরে না আসে, তখন শুধু অজু করেই নামায শুরু করে দিবে। রোজাও শুরু

করবে। এ ক্ষেত্রে গোসল করা জরুরী নয়, কেননা এখনো তা হায়েয বলে গণ্য হয়নি। (প্রাগুক্ত) শামিয়া, খ. ১, পৃ. ৪৮৯

এতক্ষণ পর্যন্ত সূচনা স্রাববিশিষ্ট মহিলাগণের স্রাবহীনতা এবং ঐ সকল মহিলা, যাদের পূর্বের হায়েযের মধ্যস্থ স্রাবহীনতার কোন ধারা বা নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, তাদের স্রাবহীনতায় কী করণীয় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

আর যে সকল মহিলার পূর্বের হায়েয-নিফাসের মাঝে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফাঁকা সময় অতিবাহিত হওয়ার অভ্যাস রয়েছে, তারা তাদের অভ্যাসগত ফাঁকা সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যেমন কারো হায়েয বা নিফাসের স্রাব দুদিন চলার পর একদিন ফাঁকা থাকে। তাহলে এ ধরনের মহিলা চলতি হায়েযে তৃতীয় দিন অপেক্ষা করবে। এর মাঝে যদি তার অভ্যাসমত ৪র্থ দিনে হায়েয এসে যায় তাহলে তো সে হায়েযগ্রস্তই বলে বিবেচিত হবে।

আর যদি ৪র্থ দিনেও স্রাব না আসে তখন ৪র্থ দিন থেকে নামায শুরু করবে। এমনিভাবে যে মহিলার যে ধরনের স্রাবহীনতার অভ্যাস রয়েছে সে সে মোতাবেক আমল করবে। (প্রাগুক্ত)

আর এসব সুরতে সহবাসের বিধান কী? তা হায়েয বন্ধ হওয়ার আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে।

এভাবে আমল করতে থাকবে। দশ দিনের পূর্বে পুনরায় স্রাব পরিলক্ষিত হলে নামায রোজা থেকে বিরত থাকবে। হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের মত দিন গুজরান করতে থাকবে। দশ দিন পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে। দশ দিনের পর স্রাবহীনতা ও নবাগত স্রাবের বিধান সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমনটি অতিরিক্ত স্রাবের আলোচনায় বলে এসেছি যে, কোন্ সময় কতটুকু স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে আর কতটুকু ইস্তেহাযা বলে গণ্য হয়। এখানে সে মোতাবেক আমল করতে হবে। (আদদুররুল মুখতার ও শামী, খ. ১, পৃ. ২৯৪, ফাতহুল কাদীর খ. ১, পৃ. ১৭৩)

আর আদত বিশিষ্ট মহিলার আদতের পর এবং আদত অনিয়ম মহিলার আগের হায়েযের মেয়াদের পর স্রাবহীনতা দেখা দিলে, কিভাবে দিনাতিপাত করবে ইবাদত বন্দেগী করবে, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে হায়েয বন্ধ হওয়ার আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেননা আদতের পর দীর্ঘ স্রাবহীনতা হায়েয বন্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

যে যে রঙের হায়েয পরিলক্ষিত হয়ে থাকে

হায়েযের দিনগুলোতে মেয়েদের যে স্রাব এসে থাকে তা সাধারণত লাল রঙের হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় স্রাব পুরোপুরি লাল রঙে আসে না।

বরং কিছুটা কালো বা হলুদ অথবা ঘোলাটে, মাটি ও সবুজ রঙের ভাবও তাতে পরিলক্ষিত হয়। এসব ধরনের স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে।

আর বিভিন্ন ধরনের স্রাব চলতে চলতে হায়েযগ্রস্ত মহিলাগণ এক সময় সাদা স্রাব দেখতে পায়। যখন তারা সাদা স্রাব দেখতে পাবে, তখন আর তারা হায়েযগ্রস্ত থাকবে না। কেননা সাদা স্রাব হায়েযের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা হায়েয বন্ধ হওয়ার নিদর্শন। (হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর খ. ১, পৃ. ১৩৫, শামিয়া : খ. ১, পৃ. ২৮৯, ইনায়া খ. ১, পৃ. ১৬৫)

হায়েয নিরাশার বয়স

"হায়েয-পবিত্রতার" পরিক্রমা মহিলাদের জীবনে অব্যাহত থাকে। মহিলাদের জীবন এধারাতেই কেটে যায়। এর মধ্যে স্রাবে কতো বিভিন্নতা হয়, পবিত্রতায় কতো উলট পালট হয়, তার কোন ইয়াত্তা নেই। স্রাবের রঙেও বিভিন্নতার অভাব নেই। যেমনটি পূর্বের আলোচনায় কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

তো মহিলাদের জীন্দেগী চলতে চলতে এক পর্যায়ে ক্রমাগত এধারা অব্যাহত থাকে না। বরং বয়সের এক পর্যায়ে তাদের স্রাবের ধারা বিঘ্নিত হয়। স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, আর আসে না। হায়েয না আসার এ বয়স হল ৫৫ বছর। এ বয়সে মহিলাদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় আয়েসা বলা হয়। মানে স্রাবহীন মহিলা। হায়েয মুক্ত মহিলা।

(আদদুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ৩০৩ ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ১৬৫)

কিন্তু কিছু মহিলা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। এ বয়সেও স্রাব চলতে থাকে। লাল বা কালো রঙের স্রাবই এসে থাকে। এভাবে লাল বা কালো রঙের স্রাব এ বয়সে কারো চলতে থাকলে সে আয়েসা বলে পরিগণিত হবে না। বরং সে হায়েযগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে। (শরহে বেকায়া : খ. ১, পৃ. ১০৯)

তবে যদি হায়েয নিরাশা বয়সে পৌঁছার পূর্বে কোন মহিলার লাল বা কালো রঙ ছাড়া অন্য রঙের হায়েয আসত, যেমন হলুদ রঙের স্রাব আসত অথবা সবুজ রঙের স্রাব আসত এবং হায়েয নিরাশা বয়সে পৌঁছে ও তার হলুদ বা সবুজ রঙের স্রাব আসতে থাকে, তাহলে এ ধরনের মহিলার হায়েয নিরাশা বয়সেও লাল বা কারো রঙ ছাড়া অভ্যাসগত স্রাব চালু থাকলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে। এ ধরনের মহিলা হায়েযগ্রস্ত মহিলা হিসাবে পরিগণিত হবে। আয়েসা মহিলা হিসেবে গণ্য হবে না। (ফাতহুল কাদীর, উমদাতু রেআয়া : খ. ১, পৃ. ১০৯)

আর যাদের এ বয়সে ও লাল কালো রঙ ছাড়া অন্য রঙের স্রাব চালু থাকে এবং এমন স্রাব আসার অভ্যাসও তাদের না থেকে থাকে, তাহলে তারা স্রাব নিশারা মহিলাদের মত আয়েসা বলে গণ্য হবে। কেননা এবয়সে লাল বা কালো রঙ ছাড়া অন্য রঙের স্রাব আসা, স্রাব না আসার হুকুমে। যদিও এবয়সের পূর্বে অন্য রঙের স্রাব আসলে তা লাল রঙের স্রাবে হুকুমে গণ্য হয়। হায়েয বলে বিবেচিত হয়। তবে এবয়সে অন্য রঙের স্রাবগুলো ইস্‌তেহাযা বলে বিবেচিত হবে। (প্রাগুক্ত)

আর কিছু মহিলাদের স্রাব এবয়সে বন্ধ হয়ে কিছু দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় লাল বা কালো স্রাব চালু হয়ে যায়। এ স্রাবে যদি হায়েযের অন্যান্য শর্তগুলো পাওয়া যায়, তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে এবং ঐ মহিলার আয়েসা জীন্দেগী অবসান হয়ে গেছে বলে ঠাওরাবে।

(ফাতহুল কদীর : খ. ১, পৃ. ১৬৪)

নিফাসের (প্রসব পরবর্তী স্রাবের) সংজ্ঞা ও নিফাসের বিস্তারিত বিবরণ

নিফাসের প্রায় সকল বিধি-বিধান হায়েযের বিধি-বিধানের মত। যেমন মেয়াদ অতিরিক্ত স্রাব এবং নিফাসের মাঝে মাঝে স্রাবহীন মুহূর্ত এবং নিফাস ও হায়েযের মাঝে অন্তবর্তী পবিত্রতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিফাসের হুকুম এবং হায়েযের হুকুম একই। তাই হায়েযের পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে নিফাসের বিধি-বিধান জেনে নেয়া তেমন কোন কঠিন বিষয় নয়। কিন্তু পাঠকগণের সুবিধার জন্যে একটু বিস্তারিতভাবে নিফাসের বিধানগুলো এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

নিফাসের (প্রসব পরবর্তী স্রাবের) সংজ্ঞা

বাচ্চা প্রসাবের পর মহিলাগণ যে স্রাবের শিকার হয়ে থাকে, তাকে নিফাস বলা হয়। (দুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৯৯)

বাচ্চা প্রসব আসন্ন হলে প্রসবের পূর্বে অনেক মহিলার যোনিপথে রসালো পদার্থ নির্গত হয়, তা নিফাস নয়। তার কারণে নামায রহিত হয় না। কাজেই ঐ সময় নামায আদায় না করা হয়ে থাকলে ঐ নামায পরবর্তীতে সুস্থ সময়ে কাযা করে নিবে।

এমনিভাবে বাচ্চা অধিকাংশ অংশ বের হওয়ার পূর্বে যে স্রাব নির্গত হয়, তা নিফাস নয়। কাজেই ঐ সময় কোন নামায ছুটে গিয়ে থাকলে তা কাযা করে নিতে হবে। আর বাচ্চার শরীরের অধিকাংশ বের হওয়ার পর যে স্রাব চালু হয় তা নিফাস (প্রসব পরবর্তী স্রাব) বলে পরিগণিত হবে। যেমনিভাবে বাচ্চা পুরোপুরি বের হয়ে গেলে পরে যে স্রাব আসে তা নিফাস বলে পরিগণিত হয়।

অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব ও তারপর নির্গত হওয়া স্রাব

ইতোপূর্বে হায়েযের শর্তগুলোর আলোচনায় অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসবের পর যে স্রাব আসে, সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিয়ে এসেছি। তা এখানে আরেকটু খুলে বলতে চাচ্ছি। গর্ভস্থির হওয়ার পরপরই বীর্য রূপান্তরের পথ ধরে না বরং কিছু দিন পার হওয়ার পর ধীরে ধীরে বাচ্চার শেকেল-সুরত ও গঠন প্রকাশ পায়। গর্ভস্থির হওয়ার পর ১ সপ্তাহ পর্যন্ত বীর্য রূপেই তা গর্ভাশয়ে স্থির থাকে। এ সময়ের মধ্যে তা কোন রূপান্তরের শিকার হয় না।

অতঃপর তা থ্যনথ্যনে পদার্থে পরিণত হয়ে জমাট বেঁধে যায়, আর বাহিরের দিকে সূক্ষ্ম একটি আবরণ দ্বারা তা বেষ্টিত হয়ে যায়। এভাবে ১৬ দিন পর্যন্ত কেটে যায়। অতঃপর লাল জমাটবাঁধা রক্তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অতঃপর তা গোস্ত টুকরায় পরিণত হয়। গোস্ত টুকরায় পরিণত হয়ে যাওয়ার পর ২৭ দিনের মাথায় তার মাঝখানে কলবের শেকেল ও মাথায় দিমাগ এর রূপ দেয়া হয়। অতঃপর ৩২ দিনের মাথায় প্রত্যেক অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হাড় পয়দা হয়ে যায়।

এভাবে থাকতে থাকে এবং হালকা হালকা খাবার টানতে শুরু করে। আর হাড়গুলোতে ধীরে ধীরে গোস্ত জড়াতে শুরু করে। এভাবে ৭৫ দিন পর্যন্ত চলতে চলতে ৭৫ দিনের পরে তা আরো পরিবর্তিত হয়ে যায়। ধীরে ধীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পুরু হতে শুরু করে। সুষ্ঠুতা ও পূর্ণাঙ্গতার পথ আগানো শুরু করে। আর ১০০ দিন পর্যন্ত তা উদ্ভিদের মত বাড়তে শুরু করে।

১০০ দিনের মাথায় ছোট্ট ছোট্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পূর্নাঙ্গতার একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারপর ১২০ দিন পর্যন্ত প্রাণহীন প্রাণীর ন্যায় থাকে। প্রাণহীন প্রাণীর যেমন সব থাকে, কিন্তু শূন্যতা থাকে শুধু প্রাণের। এ পর্যায়েও প্রায় সব অঙ্গগুলো পূর্ণতার পথে থাকে, কিন্তু শূন্যতা থাকে প্রাণের। অতঃপর ১২০ দিন পর তাতে প্রাণ ফুঁকে দেয়া হয়। অতঃপর তা ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে যেতে থাকে। যেমনটি দাউদ আনত্বাকী স্বীয় প্রণীত গ্রন্থ তাযকিরাতে বলেছেন। (হাশিয়ায়ে শামী : খ. ২, পৃ. ৩০২)

এ বিস্তারিত আলোচনা মাথায় রেখে আমরা আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আগাতে পারি। স্বাভাবিক প্রসব ও পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্মানোর পর; যে স্রাব আসে তার হুকুম সম্পর্কে সকলেই অবগত। তা নিফাস বলে পরিগণিত হওয়ার বিষয়টি প্রায় সকলের জানা।

কিন্তু গর্ভস্থ ভ্রুণের মেয়াদ পূর্তির পূর্বে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছে অকাল গর্ভপাত হলে, পরবর্তী স্রাব নিফাস বলে পরিগণিত হয়। আর কোন পর্যায়ে তা ছুটে গেলে পরবর্তী স্রাব নিফাস বলে পরিগণিত হয় না, তা অনেক কম লোকই জানেন।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হল অকালে গর্ভচ্যুত ভ্রুণের যদি শেকেল সুরত প্রকাশ পায়, তাহলে এমন ভ্রুণের পর যে স্রাব আসে তা নিফাস বলে পরিগণিত হয়। এমনকি যদি গর্ভচ্যুত হয়ে শরীরে কোন অঙ্গের রূপ ধারণকৃত কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও যৌনি পথে প্রকাশ পায়, তাহলেও তার পরবর্তী স্রাব ও নিফাস বলে গণ্য হবে।

উপরন্তু কোন অঙ্গ বা পূর্ণাঙ্গ শরীরের সেকেল ও সুরত ধারনের পূর্বেই অকাল গর্ভপাত হলে পরবর্তী স্রাব নিফাস বলে গণ্য হবে না। তা হায়েযের শর্তের আওতায় পরলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে। অন্যথায় ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে। (দুররুল মুখতার রদ্দুন মুহতার খ. ১, পৃ. ৯০২, হিন্দিয়া খ. ১, পৃ. ৩৭, হেদায়া, ফাতহুল কদীর : খ. ১, পৃ. ১৮৯, আল ইনায়া, খ. ১, পৃ. ১৯০, বাদায়ে উস সানায়ে খ. ১, পৃ. ১৬১ যাকারিয়া)

দাউদ আনত্বাকীর পূর্বোক্ত বক্তব্যের আলোকে বুঝা যায় ৭৫-৮০ দিনের পর ভ্রুণের মাঝে মানবীয় শেকেল-সুরত প্রকাশ পায়। তাই এ ধরনের মেয়াদের ভ্রুণ গর্ভচ্যুত হলে পরবর্তী স্রাব নিফাস বলে বিবেচিত হবে। আর এ মেয়াদের পূর্বে, তথা ১৫-২০ দিন বা ৩০-৩৫ দিনের জমাট রক্ত ও গোস্তপিণ্ড ও সূক্ষ্ম হাড়ের পর্যায়ে পৌঁছে ভ্রুণ গর্ভচ্যুত হলে পরবর্তী স্রাব নিফাস বলে বিবেচিত হবে না। (প্রাগুক্ত)

এম আরের পর নির্গত স্রাবের হুকুম

কোন কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে যান্ত্রিক উপায়ে স্রাব চালু করা হয়। স্রাবের অনিয়ম দূর করে নিয়ম ফিরিয়ে আনা হয়। এভাবে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাসিকে নিয়ম করণকে ডাক্তারী চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় "এম আর" বলা হয়।

এখন আমাদের জানতে হবে, "এম আর" পরবর্তী যে স্রাব নির্গত হয় তার হুকুম কী? তা কোন ধরনের স্রাব বলে গণ্য হবে? হায়েয নাকি নিফাস, নাকি ইস্তেহাযা তথা রোগের কারণে নির্গত স্রাব?

যদি "এম আর"এর মাধ্যমে জরায়ু থেকে কোন বাচ্চা বা বাচ্চার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেরিয়ে আসে, তাহলে "এম আর" পরবর্তী স্রাব নিফাস বলে গণ্য

হবে। আর যদি বাচ্চা বা বাচ্চার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ না পায় তাহলে তা নিফাস বলে গণ্য হবে না।

বরং ঐ স্রাবে হায়েযের শর্তাবলী পাওয়া গেলে তা হায়েয (মাসিক) বলে গণ্য হবে। অন্যথায় ইসতেহাযা (রোগের স্রাব) বলে গণ্য হবে।

একই গর্ভে একাধিক সন্তান জন্মালে তখন নিফাসের হুকুম

যদি একাধিক বাচ্চা একগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়, অর্থাৎ জমজ বাচ্চা প্রসব হয় তাহলে প্রথম বাচ্চাটি ভূমিষ্ট হওয়ার পর যে স্রাব দেখা দেয়, তাই নিফাস বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয়ত বাচ্চাটি প্রসবের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ভাবে গর্ভ খালাসের পর প্রকাশ পাওয়া স্রাব দ্বারা নিফাস শুরু হবে; বিষয়টি এমন নয়।

অতএব প্রথম বাচ্চাটি প্রসব হওয়ার পর থেকে নিফাস গণনা করা শুরু হবে। এভাবে ৪০ দিনের স্রাব নিফাস বলে গণ্য হবে। যদিও দ্বিতীয় বাচ্চার স্রাব ৪০ দিন পরও চালু থাকে।

শরীয়তে দৃষ্টি জমজ সন্তান বা এক গর্ভের সন্তান বলতে কি বুঝায়, তা একটু ভালভাবে বুঝার বিষয়। আমাদের সমাজে জমজ বলতে যা সর্বসাধারণ বুঝে থাকে, তা হল পর পর দুটি সন্তান এক উদর থেকে ভূমিষ্ট হওয়া।

কিন্তু শরীয়তে এ বিষয়টিতে আরো প্রশস্ততা রয়েছে। অর্থাৎ একটি বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পর ৬ মাস অবধিকালের মাঝে যদি আরেকটি সন্তান ঐ উদর থেকে ভূমিষ্ট হয়, তাহলে এ দুসন্তানকে জমজ বলা হবে। একই গর্ভের সন্তান বলে পরিগণত করা হবে। আর ৬ মাস পর আরেকটি সন্তান একই উদর থেকে জন্মালে দু'গর্ভের সন্তান বলে গণ্য করা হবে।

কাজেই একটি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর সাথে সাথে যদি আরেকটি সন্তান জন্মে, তাহলে এ ধরনের মহিলার নিফাস গণনা করতে ঝামেলা নেই। আর যদি দ্বিতীয় বাচ্চাটি প্রথম বাচ্চার পর পরই না জন্মে, বরং একটু ফাঁকা সময় যাওয়ার পর দ্বিতীয় বাচ্চাটি জন্মে, তাহলে দেখতে হবে কতটুকু "গ্যাফ" উভয় বাচ্চা প্রসবের মাঝে অতিবাহিত হয়ে থাকে।

যদি ৪০ দিনের ভিতরেই দ্বিতীয় বাচ্চাটি জন্মে এবং তার পরও স্রাব চালু থাকে, তাহলে এ স্রাবের সার্বিক হুকুম সাধারণ নিফাসের মতোই। সূচনা নিফাস বিশিষ্ট আর আদতওয়ালী নিফাস বিশিষ্টের হুকুম এবং ৪০ দিন অতিক্রম করলে তার হুকুম ইত্যাদি এ ধরনের মহিলার ক্ষেত্রেও সাধারণ নিফাস বিশিষ্ট মহিলার মতই। তাই সে আলোকে এ মহিলার নিফাস নির্ণয় করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

আর যদি দ্বিতীয় বাচ্চাটি প্রথম বাচ্চার ৪০ দিন পর ভূমিষ্ট হয় এবং তারপর স্রাব চালু হয়, তাহলে এ স্রাব নিফাস বলে গণ্য হবে না। এ স্রাবে যদি হায়েযের শর্ত-শরায়েত পাওয়া যায় তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে। যদি না পাওয়া যায় তাহলে তা ইসতেহাযার স্রাব বলে বিবেচিত হবে। (প্রাগুক্ত)

যদি ৬ মাসাধিক কাল পর শেষ বাচ্চাটি ভূমিষ্ট হয়, তাহলে তা একগর্ভ হবে না। ভিন্নগর্ভ বলে বিবেচিত হবে, তথা জমজ বলে গণ্য হবে না। স্বাভাবিক দুটি প্রসব বলে গণ্য হবে। কাজেই তখন উভয় বাচ্চার প্রসবের পর ভিন্ন-ভিন্ন নিফাসের হিসাব করা হবে। (প্রাগুক্ত)

সিজার পরবর্তী স্রাবের হুকুম

বর্তমানে জমানায় স্বাভাবিক প্রসবের ন্যায় সিজারে বাচ্চা প্রসবের বিষয়টি সাধারণ হয়ে গেছে। তা এখন দুর্লভ কোন বিষয় নয়। তাই সিজার পরবর্তী স্রাবের হুকুম জানা সকলের আবশ্যক। সিজার পরবর্তী স্রাব ও স্বাভাবিক প্রসব পরবর্তী স্রাবের হুকুম এক ও অভিন্ন। অতএব সিজারের পর যোনিপথে স্রাব প্রকাশ পাওয়ার দ্বারা মহিলাগণ নিফাসগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে। নিফাসগ্রস্তদের মত দিনতিপাত করবে। (দুররুল মুখতার ও শামী : ২৯৯, ফতোয়ায়ে আলমগীরী : খ. ১, পৃ. ৩৭)

স্রাবহীন বাচ্চা প্রসব

বাচ্চা প্রসবের পর সকল মহিলাগণই স্রাবের শিকার হয়, বিষয়টি এমন নয়। বরং কিছু কিছু মহিলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়। তারা অস্বাভাবিক প্রসবের শিকার হয়। অর্থাৎ প্রসবের পর তাদের অন্যান্যদের ন্যায় স্রাব আসে না। কিন্তু এমন স্রাবহীনতার দরুন কোন সমস্যা নেই। বরং এ ধরনের মহিলাগণ নিফাসগ্রস্ত বলে গণ্য হবে।

তবে নিফাস অব্যাহত থাকার জন্যে শর্ত হল স্রাব চালু থাকা। এ ধরনের মহিলার স্রাব যেহেতু চালু হয়নি, তাই তাদের নিফাস অব্যাহত হয়নি। স্থায়ী হয়নি। কাজেই এ ধরনের স্রাবহীন প্রসবের পর গোসল ফরজ হয়ে যায়।

অতএব এ ধরনের মহিলাগণ আপন স্রাবহীন প্রসবের পর গোসল করবে। অতঃপর নামায- রোজা শুরু করে দিবে। গোসল করে নামায শুরু করতে যদি বিলম্ব করে, তাহলে প্রসবের পর কোন নামায ছুটে গেলে তা কাযা করে নিতে হবে এবং রোজা ছুটে গেলেও তা কাযা করে নিবে।

(হিন্দিয়া খ. ১, পৃ. ৩৭, শামিয়া : খ. ১, পৃ. ৪৯৬)

নিফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মেয়াদ

নিফাসের সর্বনিম্ন কোন মেয়াদ নেই। তাই বাচ্চা প্রসবের পর অল্প থেকে অল্প সময়েও যদি স্রাব আসে, তাও নিফাসের স্রাব বলে পরিগণিত হবে। উপরন্তু নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ হল ৪০ দিন। অতএব বাচ্চা প্রসবের পর ৪০ দিন পর্যন্ত যে স্রাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, তা নিফাস বলে পরিগণিত হবে। আর যদি ৪০ দিন অতিক্রম করে স্রাব চলতে থাকে, তাহলে ৪০ দিন অতিক্রান্ত স্রাব ইস্‌তেহাযা বলে পরিগণিত হবে। নিফাস বলে পরিগণিত হবে না। এতো হল, সূচনা নিফাস বিশিষ্ট মহিলার বিধান।

আর যাদের পূর্বে একাধিক নিফাস অতিক্রান্ত হয়ে থাকে, তাদের নিফাসের ক্ষেত্রে এক ধরনের অভ্যাস থাকে। কারো দশ দিন, কারো বিশ দিন, অথবা ২২ দিন। এভাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ব্যাপী নিফাস এসে থাকে। যাকে আদত বলা হয়। এ ধরনের মহিলাদেরকে আদত বিশিষ্ট মহিলা বলা হয়।

উপরন্তু অনেক মহিলার স্রাব আসার কোন সাধারণ নিয়ম বা অভ্যাস থাকে না; বরং একেক নিফাস একেক তারিখে বন্ধ হয়ে থাকে। এ ধরনের মহিলাকে আদত অনিয়ম মহিলা বলে আমরা ব্যক্ত করব।

আদত বিশিষ্ট ও আদত অনিয়মিত মহিলার স্রাব নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ ও তার পূর্বে বন্ধ হলে যে তারিখে বন্ধ হয় তাই নিফাস বলে গণ্য হবে এবং পূর্বো অভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে বলে ঠাওরাবে।

আর যদি স্রাব ৪০ দিন অতিক্রম করে চলমান থাকে, তাহলে আদত বিশিষ্ট মহিলার যে কয়দিনের আদত ছিল ঐ কয়দিনের স্রাব নিফাস বলে গণ্য হবে। আর বাকি স্রাব নিফাস বলে গণ্য হবে না। বরং তা ইস্‌তেহাযা বলে গণ্য হবে।

এমনিভাবে আদত অনিয়ম মহিলার চলমান নিফাসের আগের নিফাস যে কয়দিন ছিল, চলমান স্রাবেও ঐ কয়দিন নিফাস বলে গণ্য হবে। বাকি স্রাব নিফাস বলে গণ্য হবে না, বরং তা ইস্‌তেহাযা বলে বিবেচিত হবে। (দুররুল মুখতার : খ. ১, পৃ. ২৯৯, হিন্দিয়া খ. ১, পৃ. ৩৭)

আদত অতিরিক্ত স্রাবে ইবাদাত বন্দেগীর বিধান

আদত বিশিষ্ট মহিলার নিফাস, পূর্বো আদত অতিক্রম করে চলতে থাকলে এবং আদত অনিয়ম মহিলার নিফাস আগের নিফাসের মেয়াদ অতিক্রম করে চলতে থাকলে, ঐ অতিরিক্ত স্রাব নিফাসের অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি তা ইস্‌তেহাযা তথা রোগের স্রাব বলে গণ্য হবে? তা নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৪০ দিন

অতিক্রম করার উপর নির্ভর করে। ৪০ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে সুস্পষ্টভাবে তার বিধান জানা যায়। যেমনটি পূর্বে ১০ দিন ঊর্ধ্ব হায়েযের আলোচনায় বলা হয়েছে।

কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে ঐ স্রাবের হুকুম জানার আগ পর্যন্ত এ ধরনের মহিলাগণ নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের মত দিনাতিপাত করবে? নাকি ইস্‌তেহাযাগ্রস্ত মেয়েদের মত দিন আতিপাত করবে? তা ভালোভাবে বুঝার বিষয়।

শরীয়তে বিধান হল, এ ক্ষেত্রে মহিলাগণ সতর্কতাবশতঃ নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের মত দিনাতিপাত করবে। রোজা-নামায সহবাস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে। এভাবে দিনাতিপাত করতে করতে যদি ৪০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে ঐ স্রাব ইস্‌তেহাযা বলে বিবেচিত হয়ে যায়, তাহলে এদোটানা স্রাবের দিনগুলোর নামায রোজা কাযা করে নিতে হবে। (দুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৯৯)

আর যদি ৪০ দিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে রোজা কাযা করে নিবে। নামায কাযা করবে না। কেননা সদ্য বন্ধ হওয়া স্রাব নিফাস ছিল। আর নিফাস চলাকালীন দিনগুলোতে শুধু রোজা কাযা করে নিতে হয়। (প্রাগুক্ত)

নিফাসের (প্রসব পরবর্তী স্রাবের) মাঝে মাঝে স্রাবহীনতার অনুপ্রবেশ

নিফাস শুরু হওয়ার পর তা নিরবচ্ছিন্নভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলমান থাকে না। বরং হায়েযের স্রাবের ন্যায় নিফাসের স্রাবেও মাঝে মাঝে ফাঁকা সময় অতিবাহিত হয়। স্রাবহীন সময়গুলো ছোটও হয়, আবার অনেক দীর্ঘও হয়ে থাকে। এমনকি অনেকের নিফাসের শুরু ও শেষে স্রাব থাকে আর মাঝখানের পুরো সময় স্রাবহীনতায় কাটে। (শামিয়া : খ. ১, পৃ. ২৯০)

যে সমস্ত মহিলাদের একাধিক নিফাস অতিক্রান্ত হয়ে থাকে, তাদের এ স্রাবহীন মুহূর্তগুলোর ক্ষেত্রে ও এক ধরনের অভ্যাস থাকে, একটা আদত থাকে। এ ধরনের আদত বা অভ্যাসকে নিফাস অভ্যন্তরীণ অভ্যাস বা আদত বলে ব্যক্ত করা হয়।

নিফাসের ফাঁকে ফাঁকে যে স্রাবহীন সময় দেখা যায় তার হুকুম

নিফাসের ফাঁকে ফাঁকে যে স্রাবহীন মুহূর্তগুলো দেখা যায় তা অল্প সময়ে হয়ে থাকে আবার একটু দীর্ঘ সময় ব্যাপীও হয়ে থাকে। স্বল্প মেয়াদের স্রাবহীন মুহূর্তগুলো নিয়ে তেমন ভাবতে হয় না বরং সহজেই অনুমান করা যায়। তা নিফাসের হুকুমে।

আর দীর্ঘ স্রাবহীন মুহূর্তগুলোতে লক্ষ্য করতে হবে তা কখন শেষ হয়ে স্রাব চালু হয়। যদি নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৪০ দিন অতিক্রম করে স্রাবহীনতা চলতে থাকে, এর মধ্যে স্রাবের কোন আবাস না থাকে। বরং ৪০ দিন পর স্রাব চালু হয়, তাহলে এ স্রাবহীনতা নিফাসের মধ্যে গণ্য করা হবে না।

এমনিভাবে যদি ৪০ দিনের ভিতরে স্রাবহীনতার অবসান হয়ে স্রাব চালু হয় এবং তা ৪০ দিন পর বন্ধ হয়, তাহলে সূচনা নিফাস বিশিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে ৪০ দিনের আওতাভুক্ত স্রাব ও স্রাবহীনতা নিফাস বলে পরিগণিত হবে। বাকি স্রাব ইস্‌তেহাযা বলে বিবেচিত হবে।

আর আদত বিশিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে তার আদত পরিমাণ সময়, আর আদত অনিয়ম মহিলার আগের নিফাস পরিমাণ সময়, নিফাস বলে গণ্য হবে। আর নবাগত স্রাব ইস্‌তেহাযা বলে গণ্য হবে। যেমন কারো আদত ছিল ২০ দিন, অথবা আগের নিফাস এসেছিল ৩০ দিন, তাহলে এ স্রাবহীনতায় ২০ দিন অথবা ৩০ দিনের স্রাব নিফাস বলে গণ্য করা হবে। যদিও ২০ বা ৩০তারিখ স্রাবহীন সময়গুলোর মধ্যে কেটে ছিল। (রদ্দুল মুহতার ও আদ দুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ৩০০-৩০১, ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ১৭৩ পৃ. হিন্দিয়া খ. ১, পৃ. ৩৭)

আর যদি স্রাবহীনতার পর স্রাব এসে ৪০ দিনের ভিতরেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে যে দিন স্রাব বন্ধ হয়, তাই নিফাসের মেয়াদ। চাই সূচনা বিশিষ্ট মহিলা হোক, অথবা আদত বিশিষ্ট, অথবা আদত অনিয়ম মহিলা হোক এবং এর দ্বারা নিফাসের পূর্বো আদতে পরিবর্তন এসেছে বলে ঠাওরাবে। (রদ্দুল মুহতার খ. ১, পৃ. ২৯০, দুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৯৯, ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ১৭৪)

নিফাস এর ফাঁকে ফাঁকে পরিলক্ষিত স্রাবহীন মুহূর্তগুলো কিভাবে কাটাবে?

আমরা পূর্বে বলে এসেছি স্বল্প সময়ের স্রাবহীন মুহূর্তগুলো নিয়ে তেমন ভাবতে হয় না। "ইবাদাত করা ও না করা" এ ধরনের দোটানা পরিস্থিতির শিকার হতে হয় না। আর তা দীর্ঘ হতে থাকলে, ইবাদাত করা ও না করার পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। এ ধরনের দোটানা পরিস্থিতির সম্মুখিত হতে হয়। কেননা পুনরায় স্রাব এসে তা নিফাসের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যেমনটি আমরা পূর্বে বলে এসেছি।

এ দোটানা পরিস্থিতি যখন দীর্ঘ হতে থাকে তখন দেখতে হবে যাদের পূর্বে নিফাস এসেছিল তাদের আগের নিফাসগুলোতে এ ধরনের স্রাবহীন মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছিল কিনা? যদি হয়ে থাকে, তাহলে অভ্যাসগত স্রাবহীন মুহূর্তগুলোতে অপেক্ষা করতে থাকবে। অপেক্ষা করতে করতে যদি পূর্বের

অভ্যাস মতোই স্রাব ফিরে আসে, তাহলে তো এ স্রাবহীনতা নেফাসের মধ্যেই গণ্য হয়ে যাবে। কাজেই এতে নামায রোজার প্রয়োজন ছিল না। আর সে করেও নি।

আর যদি অভ্যাসগত স্রাবহীন মুহূর্তগুলো পার হয়ে গেল অথচ স্রাব বন্ধ হয়ে রইল, যেমন কারো নিফাসের মাঝে ৫ ঘণ্টা বা ১০ ঘণ্টা স্রাবহীনতার অভ্যাস রয়েছে, কিন্তু ৫ ঘণ্টা বা ১০ ঘণ্টার গণ্ডি পেরিয়েও সাব চলতে থাকে। তাহলে গোসল করে রোজা-নামায শুরু করে দিবে। তবে সহবাস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে।

এভাবে স্রাবহীন মুহূর্তগুলো কাটাবে। এভাবে কাটাতে কাটাতে যদি নিফাসের অভ্যাস ও আদতের দিনের ভিতরে স্রাব এসে যায়, তাহলে রোজা-নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যদি এর মাঝে স্রাব না দেখতে পায়, তাহলে তখন থেকে সহবাস করা যাবে।

এতো হলো অভ্যাসবিশিষ্ট নিফাসগ্রস্তদের হুকুম। উপরন্তু সূচনা নিফাসবিশিষ্ট মহিলা ও যাদের স্রাবহীনতার ক্ষেত্রে কোন অভ্যাস নেই, তাদের হুকুম হল, তারা স্রাবহীনতা দেখতে পাওয়ার পর, নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এর মাঝে যদি স্রাব ফিরে না আসে তাহলে গোসল করে নামায-রোজা শুরু করে দিবে। আর সহবাসের ক্ষেত্রে সূচনা নিফাসগ্রস্ত ৪০ দিনের অপেক্ষা করবে। (ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ১৭৩ ও ১৭৪, আদ দররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৯৯)

আর আদত বিশিষ্ট মহিলার আদতের পর স্রাবহীনতা দেখা দিলে তখন কিভাবে কাটাবে তা নিফাস বন্ধ হওয়ার বিধানে আলোচনা করা হবে। কেননা এ সময়ে স্রাবহীনতা দেখা দেয়া স্রাব বন্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

নিফাস ও হায়েযের মাঝে অন্তবর্তী পবিত্রতার বিবরণ

নিফাসের স্রাব শেষ হয়ে সাথে সাথে হায়েয শুরু হয় না; বরং সুস্থ-সবল মহিলাদের একটি পবিত্র সময় অন্তবর্তী হওয়ার পর পুনরায় স্রাব এসে থাকে। নিফাসের পর নবাগত স্রাব হায়েয বলে তখনই গণ্য হবে, যখন তার পূর্বে একটি পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা অতিবাহিত হয়ে থাকে। অন্যথায় তা হায়েয বলে বিবেচিত হবে না।

আর এ স্রাবহীনতা কত দিন দীর্ঘ হলে, পূর্ণাঙ্গও শরীয়ত সম্মত পবিত্রতা বলে বিবেচিত হয় এবং স্রাবহীনতা পুরো সময় ব্যাপী স্রাববিহীন থাকে, নাকি ফাঁকে ফাঁকে অপূর্ণাঙ্গ স্রাব অতিবাহিত হয়? হায়েযের আলোচনায় আমরা তা উল্লেখ করে এসেছি। (আদদুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার খ. ১, পৃ. ২৩)

আর সূচনা নিফাস বিশিষ্ট মহিলার ৪০ দিন ঊর্ধ্ব স্রাব এবং আদত বিশিষ্ট মহিলার আদত অতিরিক্ত স্রাব এবং আদত অনিয়ম মহিলার আগের নিফাস অতিরিক্ত ইস্‌তেহাযার স্রাবও কোন সময় পবিত্রতার মধ্যে গণ্য হয় তা এখানে পুনরায় বলার প্রয়োজন মনে করছি না। কেননা নিফাসগ্রস্ত মহিলার এ ধরনের স্রাব ও হায়েযগ্রস্ত মহিলার এ ধরনের স্রাবের হুকুম এক ও অভিন্ন। কাজেই পূর্বের আলোচনার আলোকে এ স্রাবে হুকুম নির্ণয় করে আমল করে যাবে।

(আদদুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ৩০১, ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ১৭৩)

নিফাসে (প্রসব পরবর্তী স্রাবে) মহিলাদের কুসংস্কার

অনেক মহিলা এমনও রয়েছেন, যারা মনে করেন, বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পর ৪০ দিন পর্যন্ত নামায-রোজা করা যায় না, চাই স্রাব আসুক আর নাই আসুক। এমন মহিলাগণ স্রাব না আসলেও নামায-রোজা করেন না। এমনিভাবে ৪০ দিনের পূর্বে স্রাব বন্ধ হয়ে গেলেও ৪০ দিনের অপেক্ষা থাকেন। ৪০ দিন পার হওয়ার পরই নামায-রোযা করেন।

এ ধরনের ধারণা ও তদানুযায়ী আমল করা ঠিক নয়। কেননা আমরা পূর্বে বলে এসেছি। যে, স্রাব ৪০ দিনের সীমার মধ্যে যখনই নিঃশেষ হবে, তখনই নিফাস শেষ হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে। তাই নামায-রোজা শুরু করে দিতে হবে।

আর যদি স্রাব একেবারে নাই আসে, তাহলে তো কোন নামাযই ছেড়ে দেয়ার অবকাশ নেই। বরং ফরজ গোসল করে নামায শুরু করে দেয়া আবশ্যক। বাচ্চা প্রসব হলে ৪০ দিন পর্যন্ত নামায-রোজা ছেড়ে দেয়া বড় ধরনের একটি ভুল প্রচলন।

এমনিভাবে অনেক পুরুষ, স্বীয় স্ত্রীর বাচ্চা প্রসবের পর ৪০ দিন পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা বৈধ মনে করেন না। তার কাছে ভিড়ে না, তার কামরায় যায় না, তার সাথে খানা-পিনা করে না।

এমনটি ঠিক নয়। বরং নিফাস যদি ৪০ দিনের ভিতরেই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তখন থেকেই স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যাবে। ৪০ দিন পার হওয়ার অপেক্ষা করা লাগবে না।

উপরন্তু নিফাস অবস্থায় স্ত্রীর কাছে যাওয়া, একত্রে খানা-পিনা ইত্যাদি করা, সবই বৈধ। এগুলো থেকে দূরে থাকা বড়ই মন্দ কুসংস্কার, যা থেকে আমাদের জন্যে বেঁচে থাকা জরুরী।

ইন্‌জেকশন ও ঔষধের কারণে হায়েয-নিফাসে অনিয়ম

জন্মরোধজনিত ঔষধ বা ইন্‌জেকশন ব্যবহার করলে ও সেবন করলে, হায়েয-নিফাসের সাধারণ নিয়মে ব্যাঘাত ঘটে। কিছু ঔষধ আছে যেগুলো সেবন করতে থাকলে পবিত্রতা লম্বা হতে থাকে। যত দিন ঔষধ সেবন করবে ততদিনই লম্বা হবে। কিন্তু কিছু অন্য ধরনের ঔষধও আছে যেগুলো খেলে স্রাব চালু হয়ে থাকে।

আবার এমনও দেখা যায় যে, ঔষুধ খেতে খেতে এক পর্যায়ে তা বন্ধ করে দিলে স্রাব চালু হয়ে যায়। ঔষধ অথবা যে কোন মাধ্যমে কোন মহিলার হায়েয-

নিফাসের স্রাব বন্ধ করে দিলে তখন সে মহিলা হায়েযগ্রস্ত বা নিফাসগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে না। বরং সে পবিত্র মহিলা বলে গণ্য হবে।

(দুররুল মুখতার : খ. ১, পৃ. ২৮৪)

কেননা আমরা পূর্বে বলে এসেছি যে, হায়েয প্রমাণিত হওয়ার জন্যে স্রাব চালু হওয়া জরুরী। আর নিফাসের বিধান অব্যাহত থাকার জন্যে স্রাব চালু থাকা আবশ্যক। স্রাব চালু হওয়া ব্যতীত হায়েয প্রমাণিত হয় না, নিফাস অব্যাহত থাকে না।

এমনিভাবে ঔষধ বন্ধ রাখলে বিভিন্ন ঔষধে অভ্যস্ত মহিলাদের অনেক অনিয়ম হয়, যেমন একদিন দু-এক ফোঁটা স্রাব আসে। আবার হয়ত ২দিন বা ৫দিন পরে এক ফোটা আসে। আবার একদিন এক ফোঁটা স্রাব আসার পর ১০ পনের দিন পর বা ততোধিক সময় পার হওয়ার পর দু-এক ফোঁটা স্রাব আসে; অথবা পুনরায় স্বাভাবিক স্রাব চালু হয়ে যায়। এমন হাজারো সুরত ও পন্থায় অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

ব্যক্তিবিশেষে তাতে প্রত্যেক মহিলা স্বতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন একাধিক সুরতও পরিলক্ষিত হয়। যেগুলোর সুরত সহ হুকুম এখানে উল্লেখ করতে গেলে অনেক বিস্তর পরিসরের প্রয়োজন। যা এখানে মুনাসিব নয়। আর প্রত্যেক সুরত উল্লেখ করে হুকুম উল্লেখ করা ও প্রয়োজনাতীত।

কেননা পূর্বের আলোচনা যদি ভালভাবে বুঝে অধ্যায়ন করা হয়, হায়েয-নিফাস প্রমাণিত হওয়ার বিষয়গুলো বুঝে নেয়া হয়, শর্তগুলো ভালভাবে আয়ত্ব করা হয়, তাহলে স্রাবে যত ধরনের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হোক। যত ভিন্নতা আসুক, যত রূপান্তর তাতে পরিলক্ষিত হোক, তা নির্ণয় করা খুব সহজ হয়ে যাবে।

আর একারণে আমরা পূর্বো হায়েয-নিফাস নির্ণয়ের আলোচনা করেছি এবং ইসতেহাযার বিবরণও দিয়েছি, অতঃপর ঔষধ ও ইনজেকশনের প্রভাবে অনিয়ম স্রাবের আলোচনা শুরু করেছি, যাতে পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ অনিয়ম স্রাবের হুকুম খুব সহজে সকলের বুঝে আসে।

ইনজেকশন বা ঔষধের প্রভাবে হায়েয-নিফাস বন্ধ হলে, তাতে রোজা নামায ইত্যাদির বিধান

ইনজেকশন বা ঔষধ, যে কোনভাবে হায়েয অথবা নিফাস বন্ধ করে দিলে, তখন আর ঐ মহিলা হাযেয বা নিফাসগ্রস্ত থাকে না। বরং হায়েয নিফাসবিহীন মহিলাগণের হুকুমে গণ্য হয়ে যায়। তাই, সুস্থ মহিলাদের মতো রোজা-নামায, তথা যাবতীয় হুকুম আহকাম তার উপর আবশ্যক হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হায়েয-নিফাসের হুকুম

এতক্ষণ পর্যন্ত পূর্বোক্ত আলোচনায় মহিলাদের স্রাবের বিবরণ দিয়েছি। তাতে সুস্পষ্টভাবে বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, তা কখন হায়েয বলে গণ্য হয়; আর কখন তা নিফাস বলে পরিগণিত হয়; আর কখন তা ইস্‌তেহাযা বলে বিবেচিত হয়।

সামনে হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের বিধান প্রথমে বর্ণনা করব। অতঃপর ইস্‌তেহায গ্রস্ত মহিলা বিধি-বিধান বর্ণনা করব।

হায়েয-নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় রোজা-নামায

হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলাগণ রোজা রাখবে না, নামাযও পড়বে না। হায়েয-নিফাস অবস্থায় নামায-রোজা আদায় করা জায়েয নেই।

কেননা আলকামা ইবনে আলকামা রহ. আপন মাতা যিনি হযরত আয়েশা রা. এর বাঁদী ছিলেন। তার থেকে বর্ণনা করেন :

إِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدَّرْجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ فِيْهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ تَسْئَلُنَهَا مِنَ الصَّلٰوةِ فَتَقُوْلُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتّٰى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَةَ . تُرِيْدُ بِذَالِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ۔

অর্থ : মহিলাগণ আপন মাসিকের সময় ব্যবহার করা পট্টিসমূহ, ব্যাগে করে হযরত আয়েশা রা. কাছে পাঠাত। যে পট্টিগুলোর মাঝে হায়েযের স্রাবের হলুদাভাস পরিলক্ষিত হতো। এর মাধ্যমে তারা উম্মুল মোমিনীনের কাছে নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করত। অর্থাৎ এ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর কি নামায পড়া যাবে কি না? তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন, পিউর সাদা স্রাব দেখার আগ পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করবে না। (মুয়াত্তায়ে মালেক ও মুহাম্মদ)

আব্দুল হাই লাখনবী রহ. বলেন, হযরত আয়েশা রা. তার একথা দ্বারা হায়েয থেকে পবিত্রতার বিষয়টি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

আরো ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ اِعْتَزِلْنَ الصَّلٰوةَ مَارَأَيْتُنَّ ذَالِكَ حَتّٰى لَا تَرَيْنَ اِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا۔

অর্থ : হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, তোমরা যখনই তা দেখতে পাবে, নামায থেকে বিরত থাকবে। যতক্ষণ না খালেস সাদা স্রাব দেখতে না পাও। (ইবনে আবী শাইবা)

হাদীসে আরো এসেছে–

تَقْعُدُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمُرِهَا لَا تَصُوْمُ وَلَا تُصَلِّي۔

অর্থ : তোমাদের প্রত্যেকে প্রায় জীবনের অর্ধেকই বসে কাটায়। রোজা রাখে, নামায আদায় করে না।

এ হাদীসে মেয়েদের ব্যাপারে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা হায়েযের দিনগুলো বসে কাটায়, মানে নামায-রোজা করে না। রাসূলের এ সংবাদ প্রমাণ বহন করে যে, তাদের নামায-রোজা করা অবৈধ। অন্যথায় তিনি ফরজ বিধান ছেড়ে দেয়ার বিষয় মেনে নিতেন না। বরং কড়া ভাষায় তার নিন্দা জ্ঞাপন করতেন।

আরেকটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي۔

অর্থ : তুমি হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দাও। অতঃপর গোসল কর, অতঃপর নামায আদায় কর। (বুখারী, মুসলিম)

হায়েয-নিফাস বন্ধ হলে রোজাগুলো কাযা করবে, নামায কাযা করা লাগবে না

তবে হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে রোজাগুলো কাযা করে নিতে হবে। উপরন্তু নামাযগুলো কাযা করা লাগবে না। (রদ্দুল মুহতার : খ. ১, পৃ. ২৯০ ও ২৯১)

কেননা, হযরত আয়েশা রা. বলেন :

كَانَتْ إِحْدَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا تَقْضِى الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِى الصَّلٰوةَ۔

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমাদের কেউ যখন আপন হায়েয থেকে পবিত্র হত তখন রোজাগুলো কাযা করত। নামায কাযা করত না। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত মুয়াযা বিনতে আব্দুল্লাহ বিন আল আদবীয়া বলেন :

قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِيْ الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلٰوةَ فَقَالَتْ : اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ ؟ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُوْرِيَّةٍ لٰكِنِّيْ اَسْئَالُ . قَالَتْ كَانَ يُصِيْبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ۔

অর্থ : আমি আয়েশা রা. কে লক্ষ্য করে বললাম, হায়েযগ্রস্ত মহিলার কি হল? সে রোজা কাযা করে, নামায কাযা করে না। তিনি বললেন : তুমি কী হারুরিয়্যা নাকি? আমি বললাম, না আমি হারুরিয়্যা নই। তবে জানার জন্যে প্রশ্ন করছি। তিনি বলেন : রাসূলের যুগে আমরা তার শিকার হলে পরে আমাদেরকে রোজা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত! নামায কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না।

(কুতুবে সিত্তাহ)

এখানে একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝা দরকার। যদি কোন নামাযের ওয়াক্তে হায়েয অথবা নিফাস শুরু হয়ে যায় এবং ঐ নামায অনাদায় থেকে যায়, তাহলে হায়েয বন্ধ হওয়ার পর ঐ নামায আদায় করতে হবে নাকি আদায় করা লাগবে না?

এমতাবস্থায় এ ধরনের মহিলার উপর ঐ নামায কাযা করা জরুরী নয়। হায়েযের কারণে ঐ নামায ঐ মহিলা থেকে সাকেত হয়ে যাবে। বহাল থাকবে না। (ফাতহুল কদরী : খ. ১, পৃ. ১৭৫)

এমনিভাবে হায়েয অথবা নিফাস যে নামাযের ওয়াক্তে শেষ হয়, ঐওয়াক্তের নামায আদায় করা ফরজ। এমনকি হায়েয-নিফাস বন্ধ হওয়ার পর ঐ ওয়াক্তের এতটুকু সময়ও যদি বাকি থাকে, যে সময়ের মধ্যে গোসল করে কাপড় পরিধান করে নামাযের তাকবিরে তাহরীমা বাঁধা যায়, তাহলেও ঐ নামায কাজা করা ফরজ। আর যদি এতটুকু সময়ও না থাকে তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামায ফরজ হয় না। অতএব তা কাযা করাও আবশ্যক থাকে না।

এ বিধান হল ঐ সমস্ত হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের, যাদের স্রাব ১০ দিন ও ৪০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে; আগের হায়েয ও নিফাস মুতাবেক অথবা আদত মুতাবেক বন্ধ হয়ে থাকে। (ফাতহুল কদীর : খ. ১, পৃ. ১৭৫ আদ দুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৯৭)

আর হায়েয-নিফাস যদি ১০ দিন অথবা ৪০ দিনের মাথায় বন্ধ হয়। তাহলে লক্ষ্য করতে হবে, যে নামাযের ওয়াক্তে তা বন্ধ হয়েছে তার কতটুকু সময় বাকি থাকতে স্রাব বন্ধ হয়েছিল। যদি ঐ ওয়াক্তের মধ্যে তাকরিবে

তাহরীমা বাধা পরিমাণ সময় থাকতেও স্রাব বন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামায ফরজ হয়ে যাবে। তাই তা কাযা করে নিতে হবে। (আদ দুররুল মুখতার,বদ্দুল মুহতার খ. ১, পৃ. ২৯৭, ফাতহুল কদীর : খ. ১, পৃ. ১৭৫)

আর রোজার হুকুম ও নামাযের হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ হায়েয ও নিফাস যদি সর্বোচ্চ মিয়াদের পূর্বে, আদত ও আগের হায়েয-নিফাসের তারিখে ও মেয়াদে বন্ধ হয়। তাহলে সুবহে সাদিকের পূর্বে গোসল করা ও কাপড় পরিবর্তন করা ও তাকবিরে তাহরীমা বলার মত সময় পাওয়া গেলে, ঐদিনের রোজা ফরজ হয়ে যাবে। তাই ঐ দিনে রোজা অবশ্যই পালন করতে হবে। তা ছেড়ে দেয়ার সুযোগ নেই। ইচ্ছা করে তা কাযা করলে গুনাহগার হবে।। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার খ. ১, পৃ. ২৯৭, শরহে বেকায়া খ. ১, পৃ. ১১৫)

আর যদি হায়েয-নিফাস সর্বোচ্চ মেয়াদ তথা ১০ বা ৪০ দিনের মাথায় শেষ হয়, তাহলে সুবহে সদিকের পূর্বে শুধু তাকরিবে তাহরীমা বলা পরিমাণ সময় পেলেও ঐ দিনের রোজা ফরজ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, আদ দুররুল মুখতার : খ. ১, পৃ. ২৯৭)

এখানে একটি বিষয় বুঝতে হবে, তাকবিরে তাহরীমা বলতে এখানে পূর্ণ তাকবির তাহরীমা উদ্দেশ্য নয়। বরং শুধু আল্লাহু শব্দ উচ্চারণ করা পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহু শব্দই হল তাকবিরে তাহরীমার মৌলিক বিষয়।

অতএব হায়েয ও নিফাস, সর্বোচ্চ মেয়াদ তথা ১০ দিনে ও ৪০ দিনে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কোন নামাযের ওয়াক্তের খুব স্বল্প পরিমাণ মুহূর্ত, যেমন আধ সেকেন্ড বা এক সেকেন্ড সময় পাওয়ার দ্বারা ঐ ওয়াক্তের নামায ফরজ হয়ে যাবে। এমনিভাবে সুবহে সাদিকের পূর্বেও এক্ষেত্রে এতটুকু সময় পেলে রোজা ফরজ হয়ে যাবে। (শামিয়া : খ. ১, পৃ. ২৯৫)

গোসলের সময়

আমরা পূর্বোক্ত আলোচনায় বলে এসেছি যে, সর্বোচ্চ মেয়াদের পূর্বে হায়েয-নিফাস বন্ধ হওয়ার পর যদি এতটুকু সময় পাওয়া যায়, যাতে গোসল করে, কাপড় পরিবর্তন করে, তাকবিরে তাহরীমা বাঁধা যায়। তাহলে ঐ নামায কাযা করতে হবে। এখন বুঝা দরকার গোসলের সময় বলতে কতটুকু সময় উদ্দেশ্য।

মানুষ ভেদে ও সময় ভেদে গোসলের সময়ে অনেক তারতম্য হয়। কারো ৫ মিনিটে গোসল হয়ে যায়, আবার কারো আধা ঘণ্টায়ও হয় না। এমনিভাবে কোন সময়ে খুব অল্প সময়ে তাড়াহুড়া করে গোসল সেড়ে ফেলা হয়, আবার অনেক সময় দীর্ঘ সময়ও ব্যয় করা হয়।

বিশেষ করে আমাদের সমাজের লোকদের গোসল সম্পাদন করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। ৩০ মিনিট থেকে ৪০ মিনিট সময়ও অনেক গোসলে ব্যয় করে থাকে। এখানে কি এত দীর্ঘ সময়ের গোসল উদ্দেশ্য?

এখানে গোসলের সময় দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এত স্বল্প সময়, যার মধ্যে গোসলকারিনী গোসলের আবশ্যকীয় বিষয়গুলো সম্পাদন করতে পারে, অর্থাৎ শরীরে ও কাপড়ে নাপাকী থাকলে তা দূর করে, নাকে পানি দিয়ে, কুলি করে গোটা শরীরে পানি পৌঁছাতে পারে এবং কাপড় পরিবর্তন করতে পারে। এতটুকু সময়ই, গোসলের সময়ের মধ্যে পরিগণিত হবে। এছাড়া সাবান লাগানো ও গা ঘষামাজা করা এবং কাপড় ইত্যাদি ধোয়া গোসলের সময়ের মধ্যে গণ্য হবে না। (দুররুল মুখতার ও বদ্দুল মুহতার : খ. ১, পৃ. ২৯৫)

রোজা অবস্থায় হায়েয প্রকাশ পেলে করণীয়

আর রোজা অবস্থায় হায়েয-নিফাস শুরু হলে ঐ রোজা বাকি থাকবে না। এমনকি সূর্য ডোবার স্বল্প সময় পূর্বেও হায়েয-নিফাসের স্রাব প্রকাশ পেলে রোজা বাকি থাকবে না। কিন্তু রোজাদারদের সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করতে হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমনটি রোজাদার করে থাকে। আর পরবর্তীতে এ রোজাটি কাযা করে নিতে হবে। এমনিভাবে রমজানের যেদিনে হায়েয-নিফাস বন্ধ হয় ঐ দিনের রোজা কাযা করতে হবে।

(আদ্ দুররুল মুখতার , রদ্দুল মুহতার : খ. ১, পৃ. ২৯০, শরহে বেকায়া খ. ১, পৃ. ১১৫)

এমনকি কোন মহিলার হায়েয বা নিফাস যে দিন বন্ধ হয়, যদি ঐদিন সুবহে সাদিক থেকে কিছু না খেয়ে থাকে এবং হায়েয বন্ধ হওয়ার পরও না খেয়ে, পান না করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়; তাহলেও ঐ দিনের রোজা আদায় হবে না। বরং ঐ দিনের রোজা কাযা করতে হবে। আর রোজার নিয়তে না খেয়ে থাকলে গুনাহগার হবে। তবে অন্য কোন কারণে সূর্যাস্ত পর্যন্ত না খেয়ে থাকলে গুনাহগার হবে না। (দুররুল মুখতার, শামী : ১, পৃ. ২৯০)

জাগ্রত হয়ে হায়েয দেখতে পেলে তার হুকুম

যদি কোন মহিলা পবিত্রতাবস্থায় ঘুমায় আর ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তার হায়েয চলমান পায়, তাহলে ঐ মহিলা যখন থেকে স্রাব দেখতে পায়; তখন থেকে হায়েযগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে, এর আগ থেকে হায়েযগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে না।

অতএব রাত্রে ইশার নামায পড়া ব্যতীত যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে এবং সুবহে সাদিকের পর জাগ্রত হয়ে দেখতে পায় যে, স্রাব চালু হয়ে গেছে। তাহলে ইশার নামায রহিত হবে না বরং তা হায়েয বন্ধ হওয়ার পর কাযা করে নিতে হবে।

এমনিভাবে জহুরের নামায না আদায় করে ঘুমানোর পর আসরের সময় জাগ্রত হয়ে হায়েযের স্রাব দেখতে পেলে, আসরের নামায থেকে হায়েযগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে। অতএব জহুরের নামায পরবর্তীতে কাযা করে নিতে হবে। অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। (রদ্দুল মুহতার খ. ১, পৃ. ২৯১ আদ দুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৯১ ফাতহুল কদীর : খ. ১, পৃ. ১৭৪)

জাগ্রত হয়ে হায়েয বন্ধ পেলে তার হুকুম

উপরন্তু হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলা যদি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখে হায়েয বা নিফাস বন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে সে যখন থেকে ঘুমের ঘোরে আবিষ্ট হয়ে ছিল। তখন থেকে নিফাস ও হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে। যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হল, আর স্রাবহীনতা পেল, তখন থেকে নয়।

অতএব হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলা যদি ইশারের ওয়াক্তে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়, আর ফজরে উঠে স্রাব দেখতে না পায়, তাহলে ইশার নামায কাযা করতে হবে। ইশার নামায ছেড়ে দেয়া বৈধ হবে না। তা কাযা না করলে গুনাহগার হবে।

এমনিভাবে হায়েয-নিফাস নিয়ে, অন্যান্য ওয়াক্তে ঘুমিয়ে, জাগ্রত হয়ে স্রাব না পেলে, ঘুমানোর ওয়াক্ত থেকে হায়েয-নিফাস বন্ধ হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে। (আদ দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার : খ. ১, পৃ. ১৯১)

নফল নামায-রোজায় স্রাব প্রকাশ পেলে কী করণীয়

নফল নামাযে মগ্ন থাকা অবস্থায় অথবা নফল রোজার হালতে যদি কোন মহিলার হায়েয চালু হয়ে যায়; তাহলে ঐ মহিলা নামায ছেড়ে দিবে এবং তার রোজাও বাকি থাকবে না। তবে হায়েয বন্ধ হওয়ার পর ঐ নফল নামায ও রোজা কাযা করে নিতে হবে। (আদ দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার খ. ১, পৃ. ২৯১)

হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের জন্যে মুসতাহাব হল, তারা প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে নামাযের মুসল্লায় যাবে। প্রত্যহ যে সময়টুকু নামায আদায়ে মগ্ন থাকত ঐ পরিমাণ সময় তাসবিহ-তাহলিলে নিমগ্ন থাকবে। এভাবে তাসবিহ তাহলিলের মধ্যে নামাযের সময়গুলো কাটালে তাদের আমলনামায় নামাযের সাওয়াব দেয়া হবে। (রদ্দুল মুহতার : খ. ১, পৃ. ২৯০ ফাতহুল কদীর : খ. ১, পৃ. ১৬৪)

এমনিভাবে রমাজান মাসে হায়েয-নিফাস চলতে থাকলে তখন রোজাদারের সামনে পানাহার থেকে বিরত থাকবে। বরং তাদের অগোচরে পানাহার করবে।

সিজদায়ে তেলাওয়াতের হুকুম

সিজদায়ে তেলাওয়াতের হুকুম ও নামাযের হুকুমের ন্যায়। অতএব হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলা সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করতে পারবে না। আদায় করা জায়েয হবে না। যদি কেউ এ অবস্থায় সেজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করে তা আদায় হবে না। বরং তা পুনরায় কাযা করতে হবে। (শামিয়া : খ. ১, পৃ. ২৯১)

হায়েয-নিফাস অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করার বিধান

হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলা কুরআন কারীম স্পর্শ করতে পারবে না। এ অবস্থায় কুরআন কারীম স্পর্শ করা জায়েয নেই। এ অবস্থায় যদি কুরআন স্পর্শ করে তাহলে গুনাহগার হবে।

কেননা কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ-

অর্থ : একমাত্র পুতঃপবিত্রগণই তা স্পর্শ করে থাকে। (সূরা ওয়াকেয়া : ৭৯)

হযরত ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত :

لَا يَمَسُّ الْقُرْءَانَ إِلَّا طَاهِرٌ وَالْعُمْرَةُ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ-

অর্থ : একমাত্র পবিত্র ব্যক্তিই কুরআন স্পর্শ করে। আর ওমরা হল ছোট হজ্জ। (মুজামে কাবির মুজামে ছাগীর, হাদীসটির সকল রাবীগণই নির্ভরযোগ্য)

এমনিভাবে ওমর রা. ইসলাম আনয়নকালে তার বোন বলেছিলেন : নিশ্চয়ই তুমি অপবিত্র। আর ইহা একমাত্র পবিত্রগণই স্পর্শ করতে পারে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা, মুজামে তবরানী)

হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলা রুমাল, তোয়ালে, গামছা ইত্যাদির অন্তরালের মাধ্যমে কুরআনুল কারীম স্পর্শ করতে পারবে। তাতে কোন গুনাহ হবে না। আর আপন ব্যবহার্য জামার আস্তিন, উড়না বা জামার প্রান্ত দ্বারা কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা মাকরূহে তাহরীমি।

অর্থাৎ, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন কোন কাপড় ইত্যাদির অন্তরালের মাধ্যমে কুরআনুল কারীম স্পর্শ করতে কোন বাধা নেই। পক্ষান্তরে শরীরে ব্যবহার করত অবস্থায় কাপড়ের কোন প্রান্ত বা অংশ দ্বারা কুরআন স্পর্শ করা ঠিক নয়। এই ধরনের ব্যবহার্য কাপড় দ্বারা কুরআন স্পর্শ করা মাকরূহে তাহরীমি।

(শামিয়া, ১,৪৮৯, যাকারিয়া)

তবে গিলাফের মাঝে কুরআন কারীমের যে নুসখা সংরক্ষিত থাকে, তা গিলাফসহ স্পর্শ করা যাবে। তবে যে মলাট কুরআনের সাথে সংযুক্ত থাকে তা কুরআনের হুকুমে। তাই এ ধরনের মলাট স্পর্শ করা জায়েয নেই। (শামিয়া : খ. ১, পৃ. ২৯৩ পৃ. ফাতহুল কদীর : খ. ১, পৃ. ১৭১ পৃ.)

তাফসীর গ্রন্থ স্পর্শ করার বিধান

তাফসীর গ্রন্থ স্পর্শ করা যাবে কি না তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যদি তাফসীর গ্রন্থ এত সংক্ষিপ্ত হয়, যাতে তাফসীরের তুলনায় কুরআনের পরিমাণ বেশী, তাহলে এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ ও কুরআনের হুকুমে। আর বড় ধরনের তাফসীর গ্রন্থ, যাতে কুরআনের তুলনায় তাফসীরের পরিমাণ বেশী, তা স্পর্শ করা যাবে। তবে আয়াতের স্থানগুলো স্পর্শ করা যাবে না। তা স্পর্শ করলে গুনাহ হবে। (প্রাগুক্ত)

ফাযায়েলে আমল ও অন্যান্য ধর্মীয়গ্রন্থ স্পর্শ করার বিধান

এমনিভাবে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের হুকুমও বিস্তারিত তাফসীরগ্রন্থের ন্যায়। সেগুলোও স্পর্শ করা যাবে এবং ফাযায়েলে আমলও স্পর্শ করা যাবে। কিন্তু আয়াতের স্থানগুলো স্পর্শ করা জায়েয হবে না। অতএব হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের জন্যে বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ ও ফাযায়েলে আমলও ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ পড়তে কোন সমস্যা নেই। (শামিয়া : খ. ১, পৃ. ২৯৩)

কুরআন কারীম তেলাওয়াতের বিধান

কুরআন কারীম তেলাওয়াত করাও হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মেয়েলোকদের জন্যে বৈধ নয়।

কেননা হাদীসে এসেছে :

لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ۔

অর্থ : হায়েযগ্রস্ত ও জুনুবী, (অপবিত্র) ব্যক্তি যেন কুরআনুল কারীমের কোন অংশ তেলাওয়াত না করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আদী, বাঈহাকী)

কেননা কুরআন কারীমের যে সম্মান-মর্যাদা রয়েছে তা এর দ্বারা ক্ষুণ্ন হয়। বিঘ্নিত হয়। তবে কুরআন মাজীদের কোন আয়াত অথবা সূরা দোয়া ও অজিফা, হিসাবে হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলাগণদের জন্যে পাঠ করা জায়েয রয়েছে। (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার : খ. ১, পৃ. ২৯৩)

হেফজুল কুরআন সহ কুরআনে শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের জন্যে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান

আর যে সমস্ত বোনরা কোরআন শিখে ও শেখায়। হিফজ শিখে ও হিফজ শেখায়। কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়ে তাদের জন্যে কিছুটা ছাড় রয়েছে। হায়েয-নিফাস অবস্থায় তারা আয়াতের শব্দে শব্দে থেকে থেমে পড়তে পারবে। থেমে থেমে কুরআনের আয়াত পড়া ও হিফজ করা তাদের জন্যে জায়েয ও বৈধ। আর ইমাম ত্বহাবী (রহ.) মতানুসারে আয়াতকে অর্ধেক অর্ধেক করেও পড়াতে পারবে এবং পড়তে পারবে। (শামিয়া : খ. ১, পৃ. ২৯৩)

মোবাইলে তেলাওয়াত ও কুরআন স্পর্শের হুকুম

বর্তমানে মোবাইলে কুরআন তেলাওয়াত করা ও শ্রবণ করা ব্যাপক হয়ে গেছে। যেসব মোবাইল ফোনে কুরআন ও বইপুস্তক ধারণ করা যায়, এ ধরনের মোবাইলে দ্বীনদার ভাই-বোনগণ কুরআন ধারণ করে থাকেন, সময় সুযোগে তেলাওয়াত করে থাকেন। তেলাওয়াত শ্রবণ করে থাকেন।

কিন্তু হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলাগণ মোবাইল বা কম্পিউটার থেকেও কুরআন তেলাওয়াত করবেন না। মোবাইল ও কম্পিউটারে কোরআন তেলাওয়াত করাও তাদের জন্য নিষিদ্ধ। এমনিভাবে কম্পিউটার ও মোবাইলের স্ক্রিনে যখন কুরআন প্রদর্শিত হয়, তখন তা স্পর্শ করতে পারবে না। তবে যদি স্ক্রিনে প্রদর্শিত না থাকে তাতে মোবাইলের স্ক্রিন স্পর্শ করতে কোন বাধা নেই।

আর স্ক্রিনে প্রদর্শিত থাকা অবস্থায় মোবাইলের পিছন দিক বা পার্শ্বদেশ স্পর্শ করতেও কোন সমস্যা নেই।

কুরআনুল কারীম শ্রবণের বিধান

হায়েয-নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় সরাসরি কারো মুখ থেকে অথবা মোবাইল, রেডিও, কম্পিউটার ইত্যাদি থেকে কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শ্রবণ করতে পারবে। তাতে তাদের কোন গুনাহ হবে না।

উম্মুল মোমিনিন হযরত আয়েশা রা. বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِيْ حُجْرِيْ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ۔

অর্থ : আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পেটের উপর হেলান দিতেন। অতঃপর কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত খ. ১, পৃ. ৫৬)

হায়েয-নিফাস অবস্থায় দোয়া-দূরুদ পাঠ করার বিধান

হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলার জন্যে দোয়া-দুরুদ, জিকির-আজকার, অজিফা ইত্যাদি করতে কোন বাধা নেই। এগুলো করা তাদের জন্যে বৈধ।

আর দোয়া, শিফা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে কুরআনুল কারীমের কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করা জায়েয রয়েছে। কাজেই কোন মঙ্গলজনক কাজ দেখে আলহামদুলিল্লাহ বলা এবং কোন আশ্চর্যজনক কাজ দেখে সুবহানাল্লাহ বলার দ্বারা কোন গুনাহ হবে না।

এমনিভাবে শেফার উদ্দেশ্যে সূরা ফাতেহা ও অন্যান্য সূরা বা আয়াত পড়ে অসুস্থ বাচ্চার গায়ে অথবা অন্য কোন অসুস্থ লোকের গায়ে ফুঁক দেয়াতেও কোন গুনাহ হবে না। (দুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ৪৮৮)

যদি কোন মহিলা নিয়মিত জিকির-আজকার, দোয়া-দুরুদ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নেয়, তাহলে এসব আমল হায়েয-নিফাসের দিনগুলোতেও চালিয়ে যেতে পারবে।

তাছাড়া হায়েয-নিফাস অবস্থায় যেহেতু নামায আদায় করা হয় না; তাই এসময়ে মেয়েদের অনেক অলসতা পরিলক্ষিত। ইবাদাত থেকে কিছুটা দূরত্ব দেখা যায়। কাজেই হায়েয-নিফাসের সময়ে নিয়মিত কিছু জিকির-আজকারের অভ্যাস গড়ে নেয়া দূরুদ ইত্যাদির অজিফা পড়তে থাকা, অলসতা ও ইবাদাতের দূরত্ব থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

স্বামীর সাথে নির্জনবাসের বিধান

যখন থেকে কোন মহিলার হায়েয-নিফাস শুরু হয়; তখন থেকে ঐ মহিলার স্বামী তার সাথে সহবাসে জড়াবে না, সহবাস থেকে বিরত থাকবে। এ অবস্থায় সহবাস করা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ـ

অর্থ : তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, হায়েয সম্পর্কে (অর্থাৎ হায়েযের মাঝে সহবাস সম্পর্কে)। আপনি বলুন, তা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েযের মধ্যে মেয়েদের থেকে দূরে থাক। পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করো না। যখন তারা পবিত্র হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তাদের সাথে সহবাস কর।

তবে এ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে জড়াজড়ি করতে পারবে। চুমু খেতে পারবে। জড়াজড়ি করার সময় স্ত্রীর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড়াবৃত রাখা আবশ্যক।

স্ত্রীর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত বস্ত্রহীন অবস্থায় জড়াজড়ি করা জায়েয নেই। এতটুকু ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড়াজড়িকালে অনাবৃত ও বস্ত্রহীন থাকলে সমস্যা নেই। এ অবস্থায় স্বামীর ঘনিষ্ঠতায় যাওয়া, আলিঙ্গন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ রয়েছে। (মুসলিম হাদীস নং ৩০২, আবু দাউদ হাদীস নং ২৫৮, তিরমিযী হাদীস নং ২৯৭৭, ত্বযানেসী ২০৫১, শামিয়া খ. ১, পৃ. ২৯২ ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ১৬৯ মুসনাদে আহমদ ২৫৬)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ اِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ مَايَحِلُّ لِيْ مِنِ امْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُدُّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ شَانُكَ بِاَعْلَاهَا۔

অর্থ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল যে, আমার স্ত্রী হায়েযগ্রস্ত থাকা অবস্থায় তার কোন অংশ আমার জন্যে বৈধ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, সে নিজের নিম্নাংশের কাপড় খুব ভালোভাবে বেধে নিবে। অতঃপর কাপড়ের উপরাংশ হল তোমার জন্যে বৈধ। (মুয়াত্তায়ে মালেক, দারেমী, মেশকাত, খ. ১, পৃ. ৫৬)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে ইরশাদ হয়েছে :

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَايَحِلُّ لِيْ مِنِ امْرَاتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : مَافوق الاِزَارِ وا التَّعَفُّفُ عَنْ ذَالِكَ اَفْضَلُ۔

অর্থ : আমি হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমীপে আরজ করলাম, আমার স্ত্রী হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তার কোন অংশ আমার জন্যে বৈধ হবে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, নিম্নাংশের পরিহিত কাপড়ের উপরের দিকটি হল তোমার জন্যে বৈধ। আর তা থেকেও বিরত থাকা শ্রেয়।

(মেশকাত : খ. ১, পৃ. ৫৬)

হযরত মুয়ায রা. এর হাদীস থেকে বুঝে আসে, নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড়াবৃত অবস্থায় যদিও স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা যাওয়া জায়েয, তবে তা থেকে বিরত

থাকা উত্তম। কেননা এভাবে স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতায় যাওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। সহবাসে জড়িয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে।

এ কারণেই এ মাসআলা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. এ মাসআলা বর্ণনা করার পর বলেন : أَيُّكُمْ يُطِيْقُ مَاكَانَ يُطِيْقُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ অর্থ : রাসূলুল্লাহ সা. যেভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, কে আছে তোমার মাঝে যে নিজেকে সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে?

কাজেই এমন পরিস্থিতিতে যাওয়া থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা চাই। আর যে সকল লোক এ পরিস্থিতিতে গেলে নিজেকে ধরতে পরবে না, নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, নির্ঘাত-নিশ্চিতভাবে সহবাসে জড়িয়ে যাবে। তার জন্য এ পরিস্থিতিতে যাওয়া জায়েয নেই।

এমনিভাবে রোজা অবস্থায়ও স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতায় যাওয়ার একই হুকুম। স্বামী স্ত্রী কোন একজন রোজা থাকলে সহবাস করা জায়েয নেই। সহবাস করলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। তবে স্ত্রীকে চুমু খেতে পারবে, আলিঙ্গন করা যাবে। ঘনিষ্ঠতায় যাওয়া যাবে। তবে তা থেকে বিরত থাকা উত্তম। কেননা তাতে সহবাসে জড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ পরিস্থিতিতে গেলে পড়ে নির্ঘাত-নিশ্চিতভাবে সহবাসে জড়িয়ে যাবে, তার জন্যে এ পরিস্থিতিতে যাওয়াই জায়েয নেই।

তবে যদি কেউ হায়েযে সহবাসের নিষিদ্ধতার বিধান লঙ্ঘন করে সহবাসে জড়ায়, তাহলে গুনাহগার বলে পরিগণিত হবে। তাই খালেস দিলে তাওবা করতে হবে। আর যদি হায়েযের সূচনার দিনগুলোতে সহবাস করে, তাহলে ৪.৩৭৪ গ্রাম স্বর্ণ সদকা করা মুস্তাহাব। আর যদি শেষের দিকে সহবাস করে; তাহলে ২.১৮৬ গ্রাম স্বর্ণ সদকা করা মুস্তাহাব। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, শামী খ. ১, পৃ. ২৯৮ ফাতহুল কদীর : খ. ১, পৃ. ১৬৯)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে :

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِاَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ۔

অর্থ : তিনি বলেন যে, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় তার সাথে সহবাস করে তাহলে সে যেন অর্ধ দিনার সদকা করে। (মেশকাত : খ. ১, পৃ. ৫৬)

ইবনে আব্বাস রা. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করেন :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا كَانَ دَمًا اَحْمَرَ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا كَانَ دَمًا اَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ۔

অর্থ : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি সহবাসকালে হায়েযের রঙ লাল হয়, তাহলে এক দিনার (তথা ৪.৩৭৪ গ্রাম) স্বর্ণ সাদকা করতে হবে। আর হায়েযের রঙ হলুদ হলে, তখন অর্ধ দিনার (তথা ২.১৮৬ গ্রাম) স্বর্ণ সদকা করতে হবে। (তিরমিযী, মেশকাত খ. ১, পৃ. ৫৬)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, লালরঙের হায়েয বলতে প্রথম দিকের হায়েয, আর হলুদ বর্ণের হায়েয বলতে শেষের দিকে হায়েয উদ্দেশ্য। অতএব প্রথম দিকের হায়েযে সহবাস করলে ৪.৩৭৪ গ্রাম স্বর্ণ সদকা করা মুসতাহাব। আর যদি শেষের দিকে সহবাস করে; তাহলে ২.১৮৬ গ্রাম স্বর্ণ সদকা করা মুস্তাহাব।

মসজিদে প্রবেশের বিধান

হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলাগণ মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয়। কেননা এর দ্বারা মসজিদের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়। মান-মর্যাদা বিঘ্ন হয়।

আর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় স্ত্রী হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন :

جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوْهُ بُيُوْتِ اَصْحَابِهٖ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَاِنِّيْ لَا اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ۔

অর্থ : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এসে দেখলেন যে, তার সাহাবাদের ঘরের দরজা মসজিদের ভিতরের দিকে খোলা রয়েছে। তা দেখে তিনি বলেন : ঘরের দরজাগুলো মসজিদ থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও। হায়েযগ্রস্ত ও অপবিত্র (জুনুবী) ব্যক্তির জন্যে মসজিদে প্রবেশ করা আমি বৈধ মনে করছি না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তবরানী)

তবে ঈদগাহে জানাযার নামায পড়ানোর স্থানে তারা প্রবেশ করতে পারবে। (আবু দাউদ হাদীস নং ২৩২, সুনানে বাঈহাকী খ. ২, পৃ. ৪৪২-৪৪৩, আদ দুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ২৯১)

হায়েয-নিফাস অবস্থায় ইতেকাফের বিধান

আমরা অনেকে একথা জানি যে, পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরকেও শরীয়ত ইতেকাফের বিধান দিয়েছে। পুরুষগণ রমজানের শেষ দশকে মসজিদে ইতেকাফ করা সুন্নাত। আর মহিলাগণ মসজিদে গমন করা ব্যতীত আপন ঘরের নামাযের স্থানে ইতেকাফ করবে।

পুরুষগণ যেমন রমজান ব্যতীত সারা বছর যে কোন সময় মসজিদে নফল ইতিকাফ করতে পারে, মহিলাগণও বছরের যেকোন সময় ইতেকাফ করতে পারবে।

তবে মহিলাগণের যখন হায়েয অথবা নিফাস চালু হয়, তখন তারা ইতেকাফে বসতে পারবে না। এমনিভাবে যদি ইতেকাফে বসার পর হায়েয অথবা নিফাসের শিকার হয় তখনও তাদের ইতিকাফ বাকি থাকবে না।

এক্ষেত্রে তাদের জন্যে আবশ্যক হল, ইতেকাফের স্থান থেকে অবতরণ করা। রমজানের শেষ দশক ও মান্নতের ওয়াজিব ইতিকাফে রত থাকলে তা পরবর্তীতে কাযা করে নেয়া। (শামিয়া : খ. ১, পৃ. ৫৮৪ যাকারিয়া)

হজ্জে গমনের বিধি-বিধান

কোন মহিলা হজ্জে গমন করার পর যদি হায়েয অথবা নিফাসগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে এ ধরনের মহিলা তাওয়াফ ও সায়ী ব্যতীত অন্যান্য আমল করে যাবে। যেমন মিনায় গমন করবে, আরাফায় ও মুয়দালেফায় অবস্থান করবে।

তবে তাওয়াফ করা এ ধরনের মহিলাদের জন্যে বৈধ নয়।

কেননা হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِيْ فَقَالَ مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هٰذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَّا تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيْتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالُوْا ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ۔

অর্থ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, হযরত নবীয়ে আকরাম সা. তাঁর কাছে গেলেন। আর তিনি মক্কায় প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে সারিফ নামক স্থানে হায়েযগ্রস্ত ছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, কি হল তোমার? তুমি কি হায়েযের শিকার হয়েছ নাকি? তিনি বলেন হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তায়ালা আদমের বেটিদের জন্য অবধারিত করে দিয়েছেন। হজ্জ সম্পাদনকারী যেসব কাজ করে থাকে, তুমিও তা করে যেও। তবে তুমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। (হযরত আয়েশা রা. বলেন) অতঃপর আমরা যখন মিনায় ছিলাম। আমার কাছে গরুর গোস্ত নিয়ে আসা হল। আমি বললাম, এসব আবার কি? তারা বললেন, রাসূলে আকরাম সা. আপন স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু দিয়ে কুরবানী করেছেন। (এসব তার গোস্ত) (বুখারী : খ. ২, পৃ. ২৩, হাদীস, ৫৫৪৮, কিতাবুল আযাহী)

আর সায়ী যেহেতু তাওয়াফের অনুগামী তাই সায়ী করা থেকে ও বিরত থাকবে। আর যখন হায়েয-নিফাস বন্ধ হয়ে যায় তখন তাওয়াফ ও সায়ী কাযা করে নিবে। আদ দুররুল মুখতার খ. ১, পৃ. ১৯২ ইনায়া : খ. ১, পৃ. ১৬৮)

হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের স্রাব বন্ধ হওয়ার পর বিলম্ব না করে তাওয়াফ আদায় করে নিবে, এটাই স্বাভাবিক। এটাই শরীয়তের বিধান। তবে যদি হায়েয বন্ধ হওয়ার পর কেউ বিলম্ব করে, তাহলে দেখতে হবে, হায়েয কখন বন্ধ হল।

যদি জিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখ মাগরিবের পর বন্ধ হয়, অথবা মাগরিবে এতটুকু সময় পূর্বে বন্ধ হয়, যে সময়ের মধ্যে গোসল করে অবস্থানস্থল থেকে এসে ফরজ তাওয়াফের, কমপক্ষে ৪টি চক্কর আদায় করাও সম্ভব নয়। তাহলে এ ক্ষেত্রে হায়েয বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তাওয়াফ না করে, বিলম্ব করার দ্বারা, মাসআলাগত কোন প্রভাব পড়বে না। কোন গুনাহ হবে না।

আর জিলহজ্জের ১০ তারিখ সূর্যোদয় থেকে ১২ তারিখ মাগরিবের মধ্যে এতটুকু সময় থাকতে হায়েয বন্ধ হয়, যার মধ্যে গোসল করে, অবস্থানস্থান থেকে এসে অনূর্ধ্ব ৪টি চক্কর আদায় করা সম্ভব হয়। যদি এ ক্ষেত্রে কোন মহিলা তাওয়াফ আদায় করতে বিলম্ব করে, এমনকি ১২ তারিখের সূর্যাস্ত হয়ে গেল, অথচ তার তাওয়াফ অনাদায় রয়ে গেল, তাহলে এ ধরনের বিলম্ব মাকরূহে তাহরীমী বলে বিবেচিত হবে এবং বিলম্বের কারণে একটি দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটি বকরি-ভেড়া বা দুম্বা উৎসর্গ করা আবশ্যক হয়ে যাবে।

এমনিভাবে যদি কোন মহিলা ১০ তারিখ সূর্যোদয়ের সময় হায়েযমুক্ত থাকে এবং অনূর্ধ্ব ৪টি চক্কর আদায় করার সময় অথবা তার চেয়ে অধিক সময় পেয়ে থাকে। অতঃপর তাওয়াফ আদায় করার পূর্বেই হায়েয শুরু হয়ে যায় এবং ১২

তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ হায়েয বিদ্যমান থাকে, তাহলে এ ধরনের মহিলাদের জন্যেও একটি দম উৎসর্গ করা আবশ্যক।

(আদ্দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার খ. ৩, পৃ. ৫২৯ যাকরিয়া)

অনেক মেয়েলোকরা হজ্জের সফরে এমন ঔষধ সেবন করে থাকেন, যার দ্বারা তাদের পবিত্রতা প্রলম্বিত হতে থাকে। হায়েয বন্ধ হয়ে থাকে। এরকম ঔষধ সেবন করা অনুত্তম। তাই এ ধরনের ঔষধ সেবন করা থেকে বিরত থাকবে। বরং হায়েয আসলে উপরোক্ত বিধান মতে আমল করবে।

তবে যদি কেউ ঔষধ সেবন করে স্রাব বন্ধ রাখে; তাহলে তাওয়াফ ও সায়ী স্বাভাবিকভাবে করে যাবে। স্রাব প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ সায়ীতে নিষিদ্ধতা নেই। (আদ দুররুল মুখতার : খ. ১, পৃ. ২৯৪ ইনায়া : খ. ১, পৃ. ১৬৮)

হায়েয-নিফাস অবস্থায় যে সমস্ত কাজ করা যায়

হায়েয-নিফাস অবস্থায় মহিলাগণ পানাহার করতে পারবে। ঘরের রান্না-বান্না করতে পারবে। তাদের রান্না-বান্না ঘরের সকলে খেতে পারবে। তারা যে সব বিছানা পত্র ব্যবহার করে, যে খাটে শয়ন করে, অন্যদের জন্যে তা ব্যবহার করা ও শয়ন করা বৈধ। তাতে কোন সমস্যা নেই।

এমনিভাবে তাদের পান পাত্রে অন্যরা পান করা ও তাদের আহারপাত্রে অন্যরা আহার করা জায়েয। এমনকি তাদের অবশিষ্ট আহার পানীয় ইত্যাদি অন্যরা খেতে ও পান করতে শরীয়তে কোন বাধা নেই।

এমনিভাবে হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলা ঘরের সব কাজই পারবে এবং এ ধরনের মহিলা অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের মতই স্বাভাবিক থাকবে। অন্যরাও তাকে তাদের মতই মনে করবে। অনেক মানুষ অজ্ঞতার কারণে এ ধরনের মহিলার সাথে স্বাভাবিকভাবে চলে না। বরং একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলে। এমনটি ঠিক নয়। ইসলামী শরীয়ত তা সমর্থন করে না। বরং এগুলো সামাজিক কুসংস্কার। তাই সংহতভাবে এগুলো রোধ করা ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

এ ব্যাপারে হাদীসের গ্রন্থের প্রতি তাকালে আমরা বিস্তারিত বিবরণ পাই। হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত,

قَالَ : إِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ الْاٰيَةَ)

فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْيَهُوْدَ. فَقَالُوا: مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ أَنْ يَّدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا. فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِيْ اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا۔

অর্থ : ইয়াহুদীদের মাঝে প্রচলিত ছিল যে তাদের কোন মহিলা হায়েযগ্রস্ত হলে, তারা তার সাথে একত্রে খেত না, এক ঘরে খোলামেলাভাবে তার সাথে মিশত না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ নাযিল করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা হায়েযগ্রস্তদের সঙ্গে সবই কর! তবে সহবাস থেকে বিরত থাক। একথা ইয়াহুদীদের কাছে পৌঁছার পর তারা বলল, এ লোকটি আমাদের কোন বিষয় ছাড়ে না, বরং সব বিষয়ে আমাদের বিরোধিতা করে।

একথা শুনে উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর রাসূলের দরবারে এলেন এবং হুযুরের সমীপে আরজ করলেন, ইয়াহুদীরা তো এমন এমন বলছে, তাহলে আমরা হায়েযগ্রস্তদের সাথে সহবাস করা আরম্ভ করে দিব না? একথা শুনে রাসূলের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তা দেখে আমরা ভাবলাম যে তিনি উভয়ের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। ক্রোধ যেন আর না বাড়ে এ চিন্তা করে তারা বেরিয়ে পড়ল।

ইত্যবসরে তাদের সামনে দিয়ে রাসূলের দরবারে কিছু দুধ আসল, যা রাসূলের দরবারে হাদিয়া পেশ করা হল। রাসূল তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। তাদেরকে দুধ পান করালেন। তখন তারা মনে করল যে, রাসূল কোন রাগ করেননি। (কোন রাগ রাখেননি)। (মেশকাত, খ. ১, পৃ. ৫৬)

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে :

كُنْتُ اَشْرَبُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضَعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ ، وَاَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضَعَ فِيَّ۔

অর্থ : আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় পান করতাম। অতঃপর অবশিষ্ট পানীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। তিনি পানপাত্রে আপন মুখ আমার পান করা স্থানে রাখতেন। অতঃপর পান করতেন।

এমনিভাবে আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় হাড্ডি থেকে গোস্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতাম, অতঃপর তা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে মুখ রাখতেন। (অতঃপর গোস্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতেন)। (মুসলিম, মেশকাত, খ. ১, পৃ. ৫৬)

তিনি আরো বলেন–

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حُجْرِيْ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ۔

অর্থ : আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে হেলান দিতেন। অতঃপর কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতেন।

এ সকল হাদীস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, হযরত রাসূল আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েযগ্রস্ত মহিলাদেরকে ভিন্ন চোখে দেখতেন না। হায়েযগ্রস্ত ও অনহায়েযগ্রস্তের মাঝে আচার-আচরণে তফাত করতে যেতেন না।

সমাজে এ ব্যাপারে যে কুসংস্কার ও রেওয়াজ চালু ছিল তা যেন মানুষ ভুলে যায়, ছেড়ে দেয়। তাই তিনি হায়েযগ্রস্তদের সঙ্গে গভীরভাবে মিশেছেন।

তাই তো আমরা দেখতে পাই, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় পেয়ালার যে অংশে মুখ রেখে পান করেছেন, তিনিও যত্নসহ সে অংশে মুখ রেখে পান করেছেন। উম্মুল মুমিনীন যে জায়গায় মুখ রেখে হাড় থেকে গোস্ত ছিড়ে খেয়েছেন, তিনিও ঐ স্থানে মুখ রেখে, হাড় থেকে গোস্ত ছিড়ে খেয়েছেন।

এমনিভাবে উম্মুল মুমিনীন হায়েযগ্রস্ত ছিলেন, তাতে তিনি তাকে ঘৃণা করেননি। অছ্যুত ভেবে তার থেকে আপন মোবারক শরীর তিনি দূরে রাখেননি।

বরং তার কোলেই তিনি ঠেস লাগিয়ে হেলান দিয়েছিলেন। কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করেছিলেন।

এসব আচার-আচরণের মাধ্যমে তিনি কার্যত সমাজের কুসংস্কারের মোকাবেলা করেছেন। সমাজের কুসংস্কার রোধে সোচ্চার হয়েছেন। আর তার সহধর্মীনিগণও তা খোলামেলাভাবে উম্মতের সামনে বর্ণনা করে দিয়েছেন। যাতে রাসূলের এসব শিক্ষা-দীক্ষা উম্মতের জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত দীপ্তমান থাকে।

হায়েয-নিফাস বন্ধ হওয়ার বিধান

পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মহিলাদের স্রাব হয়ত হায়েয-নিফাস বলে গণ্য হয়, অথবা তা ইস্‌তেহাযা বলে পরিগণিত হয়। যখন মহিলাদের স্রাব হায়েয-নিফাস বলে পরিগণিত হওয়ার পূর্বে বন্ধ হয়ে যায়; তখন গোসল করা ফরজ হয় না। বরং এর দ্বারা শুধু অজু ভেঙ্গে যায়, তাই নামায তেলাওয়াত শুরু করার পূর্বে অজু করে নেয়া জরুরী।

আর স্রাব হায়েয-নিফাস বলে পরিগণিত হওয়ার পর তা যে সময়ই বন্ধ হোক, চাই সর্বোচ্চ মেয়াদে বন্ধ হোক, অথবা আদত ও আগের হায়েয-নিফাসের তারিখে বন্ধ হোক অথবা আগের হায়েয-নিফাসের মিয়াদ ও আদতের পূর্বে বন্ধ হোক। এ সবগুলো সুরতে হায়েয-নিফাস বন্ধ হওয়ার পর মেয়েরা জুনুরী হয়ে যায়। যেমনিভাবে সহবাস, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ জুনুবী হয়ে যায়।

আর জুনুবী ব্যক্তির উপর গোসল করা ফরজ হয়ে যায়। গোসল করা ব্যতীত নামায, সেজদায়ে তেলাওয়াত, মসজিদে প্রবেশ, কুরআন স্পর্শ ইত্যাদি কিছুই তাদের জন্যে জায়েয নেই।

অতএব হায়েয-নিফাস বন্ধ হয়ে গেলে গোসল ফরজ হয়ে যায়, গোসল করার আগ পর্যন্ত তারা জুনুবীদের মত নামাজ তেলওয়াত, সেজদায়ে তেলাওয়াত, মসজিদে প্রবেশ, তাওয়াফ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে। গোসল করা ব্যতীত এসব কাজ করলে গুনাহগার হবে। (রদ্দুর মুহতার খ. ১, পৃ. ২৯৫-২৯৬)

জুনুবী ব্যক্তিদের জন্যে যেমন গোসলে বিলম্ব করা অনুচিত, যথা সম্ভব গোসল সেড়ে নেয়া উচিত, তেমনিভাবে হায়েয-নিফাস যখন বন্ধ হয় তখন দ্রুত গোসল করে নেয়া উচিত। বিলম্ব করা অনুচিত।

এমনিভাবে জুনুবী ব্যক্তিদের জন্যে যেমন রোজা রাখাতে কোন বাধা নেই, হায়েয-নিফাস যখন বন্ধ হয়, তখন রোজা রাখা যাবে। রোজা রাখতে কোন বাধা নেই। তবে শুধু সহবাসের ক্ষেত্রে হায়েয-নিফাস নিঃশেষ মহিলার হুকুম ও

জুনুবীদের হুকুম হুবহু এক নয়। বরং হায়েয-নিফাস নিঃশেষ মহিলার সাথে সহবাসের ক্ষেত্রে একটু ব্যাখ্যা রয়েছে।

জুনুবীদের জন্যে সহবাস করা বৈধ। সহবাসের পূর্বে গোসল করা আবশ্যক নয়, তবে মুসতাহাব। আর হায়েয-নিফাস নিঃশেষ মহিলা ক্ষেত্রে বিধান হল, যদি তাদের হায়েয-নিফাস সর্বোচ্চ মেয়াদে বন্ধ হয়। তাহলে গোসল করার পূর্বেই সহবাস করা জায়েয হবে। কেননা সহবাস নিষিদ্ধকারী জিনিস ছিল হায়েয ও নিফাস। আর সর্বোচ্চ মেয়াদে এ দুটো বন্ধ হওয়ার দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায়, যে হায়েয-নিফাস বাকি নেই। তাই এখন নিশ্চিতভাবে সে জুনুবী সাবস্ত হয়ে গেছে। তাই তার হুকুম ও জুনুবীর হুকুম অভিন্ন।

(দুররুল মুখতার, শামী : খ. ১, পৃ. ২৯৪)

আর যদি দশ ও ৪০ দিনের পূর্বে আদত বিশিষ্ট মহিলার আদত মুতাবেক আর আদত অনিয়ম মহিলার আগের হায়েযের মেয়াদ মুতাবেক হায়েয নিফাস বন্ধ হয়, তখন গোসল করা অথবা এক ওয়াক্ত নামায তার জিম্মায় ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা জায়েয নেই।

কেননা যখন হায়েয-নিফাস সর্বোচ্চ মেয়াদের পূর্বে বন্ধ হয়ে গেল, তখন পুনরায় হায়েয আসার সম্ভাবনা থাকে। ফলে সতর্কতাবশত গোসলের আগ পর্যন্ত অথবা এক ওয়াক্ত নামায তার জিম্মায় কাযা হওয়ার আগ পর্যন্ত হায়েয নিফাসগ্রস্তদের মত সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে। (হেদয়া : খ. ১, পৃ. ৬৫)

আর যদি আদত বিশিষ্ট মহিলার আদতের পূর্বে এবং আদত অনিয়ম মহিলার আগের হায়েয-নিফাসের মেয়াদের পূর্বে হায়েয-নিফাস বন্ধ হয়; তখন ও সতর্কতাবশত আদত ও আগের হায়েযে মেয়াদের আগ পর্যন্ত সহবাস থেকে বিরত থাকবে। যদিও গোসল করে নামায রোজা শুরু করে দেয়া এ ধরনের মহিলাদের জরুরী। যেমনটি আমরা অপূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা বর্ণনায় বলে এসেছি।

(হেদায়া খ. ১, পৃ. ৬৫, শরহে বেকায়া খ. ১ পৃ.)

আর সূচনা হায়েয-নিফাস বিশিষ্ট মহিলাদের হায়েয, দশ দিন পূর্বে বন্ধ হলে এবং নিফাস, ৪০ পূর্বে বন্ধ হলে, তাদের হুকুমও অনুরূপ। তারাও ১০ দিন এবং ৪০ দিন পর্যন্ত সতর্কতাবশত সহবাস থেকে বিরত থাকবে, যদিও গোসল করে নামায-রোজা চালিয়ে যাবে। (ফাতহুল কদীর খ. ১, পৃ. ১৭৩-১৭৫ আদ দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার খ. ১, পৃ. ২৯৪-২৯৫)

ফরজ গোসলের বিবরণ

স্বপ্নদোষ, সহবাস ইত্যাদি দ্বারা যেমন গোসল ফরজ হয়, এমনিভাবে যখন মেয়েদের স্রাব হায়েয-নিফাস বলে প্রমাণিত হওয়ার পর বন্ধ হয়, তখন গোসল ফরজ হয়ে যায়।

ফরজ গোসল যখন করতে যাবে তখন শরীরে ও কাপড়ে কোন নাপাকী লেগে থাকলে প্রথমে তা ধুয়ে পরিষ্কার করবে। যেমন হাদীসে এসেছে :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثم قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ،فَقَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ: كَيْفَ؟، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ۔

অর্থ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আনসারী একজন মহিলা, হায়েযের ফরজ গোসল সম্পাদন সম্পর্কে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিখালেন যে, সে কিভাবে গোসল করবে। অতঃপর বললেন, চামড়ার একটি পশমযুক্ত টুকরো নিবে। অতএব তাদ্বারা পবিত্র হয়ে নিও।

মহিলাটি বলল, তাদ্বারা কিভাবে আমি পবিত্র হব? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে নিও। সে আবার বলল, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্র হব? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি পবিত্র হয়ে নিও। আয়েশা রা. বলেন, আমি তাকে আমার কাছে টেনে নিলাম। অতঃপর বললাম, তা দ্বারা তুমি রক্তের চিহ্নগুলো খুঁজবে এবং তা ঘষে পরিষ্কার করে নিবে। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত খ. ১, পৃ. ৪৭)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাকে রক্তের নাপাক চিহ্নগুলো দূর করণের ব্যাপারে সবিশেষ নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন : ফরজ গোসলকারী ব্যক্তি প্রথমে আপন কাপড় ও পোশাক থেকে গুরুত্বের সাথে যাবতীয় নাপাকী দূর করে নিবে। কেননা তা দূর না করে পানি ঢাললে, শরীরের ও কাপড়ের নাপাকী, শরীরে ও কাপড়ে আরো ছড়িয়ে পড়বে।

নাপাকী দূর করার পর উভয় হাত ভালভাবে ধৌত করবে। অতঃপর নামাযের জন্যে যেভাবে অজু করতে হয়, যেভাবে পূর্ণাঙ্গ অজু করবে। অতঃপর প্রথমে মাথায় পানি ঢালবে। অতঃপর ডান কাঁধে, এরপর বাম কাঁধে পানি ঢালবে। অতঃপর ঘষামাজা করে পুরো শরীরে পানি পৌঁছাতে খুব যত্নবান হবে। যেন শরীরের কোন ক্ষুদ্র অংশও শুকনো না থাকে।

মহিলাগণ যদি আপন চুলে বেনী বা খোপা বেঁধে রাখে, তাহলে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো জরুরী। বেনী বা খোপা খুলে পুরো চুল ধোয়া জরুরী নয়। তবে চুল ছাড়া থাকলে তখন সবগুলো চুলই ধোয়া জরুরী।

হযরত উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত আছে–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: لَا. إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيْ عَلٰى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ۔

অর্থ : আমি হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমীপে আরজ করলাম, আমি তো আপন মাথায় বেনী বেঁধে থাকি। জানাবাতের গোসলের জন্যে কি আমি তা খুলে ফেলব? তিনি বলেন না। তোমার জন্যে যথেষ্ট হল, তুমি আপন মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালবে। গোটা মাথায় তা পৌঁছে দিবে, অতঃপর আপন শরীরে পানি ঢালবে এবং পবিত্র হয়ে যাবে।

(মুসলিম, মেশকাত, খ. ১, পৃ. ৪৮)

গোসল সম্পাদনের জায়গা যদি এমন হয়, যাতে পানি জমা হয়ে থাকে তাহলে গোসল শেষে উভয় পা ধুয়ে নিবে। অন্যথায় পা ধোয়া জরুরী নয়।

এভাবে নাপাকী দূর করার পর গোসল করলে, গোসলের পানি নাপাক হয় না। কাজেই গোসল করার সময় গা ধোয়া পানি বালতির পানিতে বা কাপড় ইত্যাদিতে পড়লে তা নাপাক হবে না। আমাদের সমাজের অনেক মানুষ তাকে নাপাক মনে করে থাকে। তাই তা নিয়ে অনেকে বিপাকে পড়ে যায়।

বাস্তবে তা হল মায়ে মুসতামাল তথা ব্যবহৃত পানি। ব্যবহৃত পানির হুকুম হল তা কোন পানির সাথে মিশ্রিত হলে লক্ষ্য করতে হবে; ব্যবহৃত পানির পরিমাণ বেশী না অব্যবহৃত পানির পরিমাণ বেশী।

যদি ব্যবহৃত পানির পরিমাণ বেশী হয় তাহলে ঐ পানির দ্বারা অজু- গোসল করা বৈধ হবে না, পক্ষান্তরে অব্যবহৃত পানির পরিমাণ বেশী হলে, তা দ্বারা অজু- গোসল করা বৈধ হবে।

উপরন্তু যদি কোন ব্যক্তির শরীরে নাপাক থাকে অথবা কাপড়ে নাপাক থাকে। তা দূর করা ব্যতীত গোসল শুরু করে দেয়; তাহলে ঐ ব্যক্তির গোসলের পানি নাপাক বলে গণ্য হবে। তাই তা পানিতে পড়লে, পানি নাপাক হয়ে যাবে। কোন কাপড়ের এক দেরহাম পরিমাণ ঐ পানি দ্বারা ভিজে গেলে ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা যাবে না।

অনেকে মনে করে থাকেন হায়েয অথবা নিফাস অবস্থায় যেসব পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হয়, ধোয়া ব্যতীত ঐ পোশাক পরে নামায রোজা করা যায় না। এমনকি ভাবা ঠিক নয়, বরং কাপড়ে স্রাবের রক্ত লাগার আগ পর্যন্ত তা পবিত্র থাকে।

যদি কাপড়ে এক দেরহামের বেশী স্রাবের রক্ত লেগে যায় তাহলে ঐ কাপড় পরে নামায আদায় করা যাবে না। বরং এমন কাপড় ধুয়ে পাক করে নিতে হবে। তবে পুরো কাপড় ধোয়া জরুরী নয়। রক্তের স্থানগুলো ধুয়ে নিলেও কাপড় পাক হয়ে যাবে।

হায়েয চলাকালে যোনি পথে ন্যাপকিন বা তুলা ব্যবহার করার বিধান

বিবাহিত ও কুমারি মহিলাগণ স্রাব চলাকালে, স্রাব থেকে আপন শরীর-কাপড় পবিত্র রাখার জন্যে যোনিপথে তুলা বা কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করা সুন্নাত। আর স্রাবহীন পবিত্রতার সময়গুলোতে বিবাহিতদের জন্যে তা ব্যবহার করা মুসতাহাব। তবে কুমারিদের জন্যে মুসতাহাব নয় বরং জায়েয।

(ফাতহুল কদীর : খ. ১, পৃ. ২৬৩-২৬৪)

যদি মহিলাগণ পবিত্র অবস্থায় তুলা বা ন্যাপকিন যোনিপথে ভিতরে ব্যবহার করে আর তা বের করার পর তাতে হায়েয বা নিফাসের স্রাব দেখতে পায়, তাহলে যে সময় রেখেছিল তখন থেকে হায়েয-নিফাসগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে। যখন তুলা বা ন্যাপকিন বের করল, তখন থেকে নয়।

অতএব কোন মহিলা ইশারের ওয়াক্তে তুলা বা ন্যাপকিন ব্যবহার করে শুয়ে থাকলে পরে, ফজরের ওয়াক্ত তুলা বা ন্যাপকিনে স্রাব দেখতে পেলে, ইশার ওয়াক্ত থেকে ঐ মহিলা স্রাবগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে।

আর হায়েয অবস্থায় তুলা ইত্যাদি ব্যবহার করার পর তা যখন বের করতে যায় তখন স্রাব বন্ধ পেলে, তুলা রাখার সময় থেকে হায়েয-নিফাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে প্রমাণিত হবে। যেমন তুলা রেখেছিল জোহরের ওয়াক্তে। আসরের ওয়াক্তে বের করে দেখল স্রাব বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে জোহরের নামাযও কাযা করতে হবে।

তুলা বা ন্যাপকিন ব্যবহারে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তুলা শুকিয়ে যাওয়ার আগে, ভেজা অবস্থায় স্রাবের কী রঙ ছিল। যদি ঐ সময়ে হায়েযের রঙগুলোর কোন রঙ তাতে পরিলক্ষিত হয়, যেমন লালস্রাব দেখা যায়। অথবা কালো অথবা হলুদ ইত্যাদি স্রাব দেখা যায়। তাহলে উক্ত স্রাব হায়েয বলে প্রমাণিত

হবে। যদিও তা শুকিয়ে সাদা রঙ ধারণ করুক না কেন। তাতে কোন সমস্যা নেই।

এমনিভাবে যদি তুলা ভেজা অবস্থায় সাদা স্রাব তাতে পরিলক্ষিত হয়,আর শুকিয়ে তা হলুদ ইত্যাদি বর্ণে বিবর্ণিত হয়; তাহলেও এ স্রাব হায়েযের স্রাব বলে গণ্য হবে না, কেননা ধর্তব্য হল, তুলা বা ন্যাপকিন ভেজা অবস্থায় স্রাব।

পরিণত বয়সের হায়েয বালেগ হওয়ার প্রমাণ বহন করে

পুরুষ-মহিলা উভয়ের একটা জীবন থাকে শিশু-কিশোর জীবন। আরেকটা জীবন থাকে পরিণত জীবন। যৌবন ও তার পরবর্তী জীবন। এদুজীবনকালের মাঝে বিস্তর তফাত রয়েছে। শারীরিক-সামাজিক দিক থেকে যেমন পার্থক্য রয়েছে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ও অনেক পার্থক্য রয়েছে। শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্যের বিষয়টি প্রায় সকলেই বুঝে। আর পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্যের বিষয়টিও গুনিজনের কাছে অস্পষ্ট নয়।

পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রের বিধি-বিধানে, শিশু কিশোরদেরকে এমন অনেক বিষয় ছাড় দেয়া হয়; যা পরিণত বয়স্কদের ব্যাপারে দেয়া হয় না। তাদের এমন অনেক বিষয় মেনে নেয়া হয় যা বয়স্কদের ব্যাপারে মেনে নেয়া হয় না। তাদের অনেক বিষয় ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়, চোখ বুঝে মেনে নেয়া হয়, যা পরিণতদের ব্যাপারে হয় না।

এমনিভাবে শরীয়তে ও শিশু-কিশোরদের ব্যাপারে ছাড় রয়েছে। যা পরিণত বয়সের লোকদের ব্যাপারে নেই। তাদের অনেক জিনিস ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়, যা বড়দের ব্যাপারে হয় না। তাদের অনেক বিষয় মেনে নেয়া হয় যা বড়দের ব্যাপারে মেনে নেয়া হয় না। কাজেই এ বয়সের শিশু-কিশোরদের প্রতি কোন বিধান ও চাপিয়ে দেয়া হয় না রং পরিণত বয়সের গণ্ডিতে পা রাখার পরই বিধি-বিধান আরোপ করা থাকে।

এখন জানার বিষয় হল শিশু-কিশোর জীবনের সীমা-পরিসীমা কতটুকু? আর পরিণত বয়সের সূচনা-শুরু হয়; কখন ও কতটুকু বয়সে? শরীয়ত কর্তৃক কিছু নির্দশন ও আলামত বেঁধে দেয়া হয়েছে। যে আলামত ও নিদর্শনগুলো পাওয়া গেলে বুঝা যায় অপরিণত বয়সের অবসান হয়ে গেছে। আর পরিণত বয়সের সূচনা হয়ে গেছে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিণত বয়সের সূচনার প্রধান ও বড় একটি আলামত হল, "নয়" বা ততোধিক বয়সে হায়েয চালু হয়ে যাওয়া। এ বয়সে হায়েয এসে যাওয়ার দ্বারা তারা পরিণত বয়স্কা ও প্রাপ্তবয়স্কা তথা বালেগা মেয়ে বলে

পরিগণিত হয়ে যাবে। এ ধরনের মহিলাদের উপর এ বয়স থেকে নামায-রোজা ফরজ হয়ে যায়।

অতএব হায়েয বন্ধ হওয়ার পর থেকে নামায শুরু করে দিতে হবে। রমজান মাস হলে রোজা শুরু করতে হবে। আর যে দিনগুলোতে হায়েয চালু ছিল সে দিনগুলোর রোজা কাযা করে নিতে হবে। এরপর থেকে নামায-রোজা ও অন্যান্য ফরজ বিধানে অবহেলা প্রদর্শন করার অবকাশ থাকবে না।

(আল ইনায়া : খ. ১, পৃ. ১৬৮)

পরিণত বয়স্কা ও বালেগা হওয়ার আরো কয়েকটি নিদর্শন হল, স্বপ্নদোষ হওয়া, বীর্যপাত হওয়া। অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার পর গর্ভস্থির হওয়া।

আর ছেলেদের পরিণত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার প্রধান আলামত হল স্বপ্নদোষ হওয়া ও বীর্যপাত হওয়া। তা ছাড়া অল্প বয়সে বিবাহ করার পর যদি স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর গর্ভস্থির হয়ে যায়, তাহলে ঐ ছেলে বালেগ বলে পরিগণিত হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছু কিছু ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এ ধরনের ছেলে ও মেয়েদের বয়স বাড়তে বাড়তে যখন ১৫ বছরে পৌঁছে যাবে; তখন থেকে তারা বালেগ বলে পরিগণিত হয়ে যাবে। এ বয়সে পর্দাপন করার পর তারা বালেগ বলে গণ্য হয়ে যাবে। বালেগদের বিধান এদের উপর প্রযোজ্য হবে।

বালেগ হওয়ার পর থেকে পুরুষ-মহিলাদের উপর যেমন নামায-রোজা ফরজ হয়ে যায়, এমনিভাবে তাদের উপর পর্দা-পুশিদা করাও ফরজ হয়ে যাবে। বেগানা পুরুষ-মহিলা পরিণত বয়সে পদার্পন করার পর, পরস্পরে দেখা সাক্ষাত করা জায়েজ নেই।

বরং অনেক মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মোটাসোটা ও সুদর্শন হয়ে যায়। ফলে পুরুষদের সামনে গেলে তাদের প্রতি পুরুষদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এ ধরনের মেয়েরা আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ার বয়সে পদার্পণ করার পর থেকে পর্দাপুশিদা করে চলতে হবে। বেগানা পুরুষদের সামনে খোলামেলা যাওয়া বৈধ হবে না। (হিন্দিয়া খ. ১, পৃ. ১২১)

তালাকের বিধান

পবিত্রতা-অপবিত্রতা, স্রাব-স্রাবহীনতার পরিক্রমাই মহিলাদের জীবন। মহিলাদের পালাক্রমশীল এজীন্দেগীর স্রাবহীন পবিত্র মুহূর্তগুলো হল তালাক দেয়ার সময় ও মুহূর্ত। এ সময়ের তালাকই শরীয়ত সম্মত তালাক। হায়েয

চলাকালে তালাক দেয়া শরীয়ত গর্হিত, অপছন্দনীয়। যদিও হাযেয অবস্থায়া দেয়া তালাক পতিত হয়ে যায়। (আল ইনায়া : ১-১৬৮)

তালাক দেয়া কখন বৈধ হয়। কোন ধারায় ও কীভাবে তালাক দিতে হয় এবং শরীয়তে তালাকের মাকাম কতটুকু তা বিস্তর আলোচনার দাবী রাখে। অতএব এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ গ্রন্থের শেষে সংযোজন করে দেয়া হয়েছে।

ইদ্দত পালনের বিধান

হায়েযের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিধান হল ইদ্দত পালন করা। মহিলাগণ বিভিন্ন কারণে ইদ্দত পালনের সম্মুখিন হয়। স্বামীর ইন্তেকাল অথবা তালাক ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে মহিলাদের উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

বয়স বিশেষ ও মহিলা বিশেষে ইদ্দত পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা হয়। হয়তবা মাস দ্বারা অথবা গর্ভদ্বারা অথবা হায়েয (মাসিক) দ্বারা ইদ্দত পালন করতে হয়। তবে ইদ্দত পালনের প্রধান ও অন্যতম মাধ্যম হল ঋতুস্রাব ও হায়েয।

যেসমস্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের রীতিমত হায়েয আসে, তারা হায়েয দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। তালাকের আলোচনায় বলেছি যে, সহবাস মুক্ত পবিত্রতাবস্থায় তালাক দেয়া হল, শরীয়তের স্বাভাবিক রীতি ও নিয়ম। আর হায়েযাবস্থায় তালাক দেয়া শরীয়ত গর্হিত ও বিদাআত। অতএব যদি কোন মহিলাকে পবিত্রতায় তালাক দেয়া হয়, তাহলে তালাকের পর তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে থাকবে। তালাকে পরবর্তী তৃতীয় হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে এ ধরনের মহিলাদের ইদ্দত নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আর যদি কেউ শরয়ী বিধিবিধানের তোয়াক্কা না করে হায়েযাবস্থায় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে যে হায়েযে তালাক দেয়া হয়েছে সে হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরো তিনটি হায়েয অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত, এ ধরনের মহিলা ইদ্দত পালন করতে থাকবে। এভাবে চারটি হায়েয অতিক্রান্ত হলে এ ধরনের মহিলার ইদ্দত শেষ হবে। (খানিয়া : খ. ১, পৃ. ৫৪৯)

আর প্রাসঙ্গিকভাবে মাস ও গর্ভ দ্বারা ইদ্দত পালনের বিষয়টি এখানে সংক্ষিপ্তাকারে বলে যাচ্ছি। যদি কোন মহিলা হায়েয নিরাশার বয়সে পৌঁছে যায় অথবা কোন মহিলার বয়স এত কম হয়, যে বয়সে হায়েয আসে না, তাহলে এ ধরনের মহিলাগণের তালাক বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে

মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। অর্থাৎ তিন মাস অবধিকাল পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে থাকবে। (প্রাগুক্ত)

আর যে মহিলাদের স্বামী মারা যায়, তারা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। আর যদি স্বামী মারা যাওয়ার সময় অথবা তালাক ইত্যাদির সময় মহিলাগণ গর্ভবর্তী হয়; তাহলে গর্ভখালাস হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ধরনের মহিলা ইদ্দত পালন করতে থাকবে। গর্ভখালাস হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ ধরনের মহিলাগণ ইদ্দতগ্রস্ত মহিলাদের মত দিন গুজরান করতে থাকবে। গর্ভখালাস হয়ে যাওয়ার দ্বারা এদের ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

আর যাদের পবিত্রতা দীর্ঘ হয়; তাদের ইদ্দত পালনের বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যে সকল মহিলাদের হায়েয আসার বয়সেও হায়েয না আসে এবং বয়সের মাধ্যমে বালেগা বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। এ ধারাতেই স্রাবহীন তা জিন্দেগীতে প্রলম্বিত হতে থাকে, তাদের ইদ্দত পালনের মাধ্যম হল মাস। আয়েসা মহিলাগণ যেমন তিন মাস ব্যাপী ইদ্দত পালন করে থাকেন এ ধরনের মহিলাগণও এভাবে ইদ্দত পালন করবে।

এমনিভাবে যে সমস্ত মহিলাগণের স্রাব চালু হয়ে তিন দিন পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার পূর্বেই স্রাবহীনতা শুরু হয়ে তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে অথবা দুএকটি বা একাধিক হায়েয ও পবিত্রতা গত হওয়ার পর দীর্ঘ পবিত্রতার শিকার হয়; তাদের হুকুমও অনুরূপ। তাদের ইদ্দতের সময় কাল ও হল তিন মাস।

(শামী : খ. ১, পৃ. ২৮৫ পৃ., খানিয়া খ. ১, পৃ. ৫৪৯)

ইস্‌তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের বিধি-বিধান

আমরা প্রথম অধ্যায়ে স্রাব নির্ণয়ের আলোচনা হায়েয-নিফাস নির্ণয়ের সাথে সাথে স্রাব কোন সময় ইস্‌তেহাযা বলে গণ্য হয়, তাও বলে এসেছি। এখন জানার বিষয় হল ইস্‌তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ কীভাবে ইবাদাত-বন্দেগী করবে? হায়েয-নিফাসগ্রস্তদের মত জীবন যাপন করবে নাকি অন্য তরিকায় দিনাতিপাত করবে?

ইস্‌তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ হায়েয-নিফাসগ্রস্তদের মত দিন গুজরান করবে না। কেননা ইস্‌তেহাযা হায়েয-নিফাসের মত কোন স্বাভাবিক স্রাব নয়। বরং তা রোগের কারণে নির্গত হয়। যেমন রোগের কারণে নাক কান অথবা শরীরের অন্যান্য স্থান থেকে রক্ত নির্গত হয়।

অতএব এ স্রাবের হুকুম, শরীরের অন্যান্য স্থান থেকে নির্গত রক্তের ন্যায়। আর শরীরের অন্যান্য স্থান থেকে রক্ত পুঁজ বেরিয়ে পড়লে যেমন মাজুর (ওজর

গ্রস্ত) বলে পরিগণিত হয়, তেমনি ইস্‌তেহাযার স্রাবের শিকার মহিলাগণও মাজুর বলে গণ্য হবে। (দুররুল মুখতার, শামী : খ. ১, পৃ. ২৯৮)

অতএব এসব মহিলাদের নামায-রোজা ছেড়ে দেয়ার সুযোগ নেই। এমন মাজুর মহিলাদের উপর সুস্থ মানুষের মত নামায-রোজা ফরজ। তবে তারা প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্যে অজু করবে। তাদের অজু ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বাকি থাকবে, যদি অজু ভঙ্গের অন্য কোন কারণ প্রকাশ না পায়। আর ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে তাদের অজু বাকি থাকবে না। পরবর্তী ওয়াক্তের জন্যে নতুন অজু করবে। (দুররুল মুখতার, শামী : খ. ১, পৃ. ৩০৫-৩০৬)

তাদের অজু যেহেতু ওয়াক্ত নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে, তাই এক অজু দ্বারা ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত যত ইচ্ছা নফল নামায, তেলাওয়াত, সেজদায়ে তেলায়াত ইত্যাদি করতে পারবে। ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে অন্য ওয়াক্তে এ অজু দ্বারা কোন ইবাদাত করতে পারবে না।

(দুররুল মুখতার, শামী : খ. ১, পৃ. ২৯৮)

ইস্‌তেহাযার সময় যেহেতু রোজা অব্যাহতি দেয়ার সুযোগ নেই। তাই রমজান মাসে ইস্‌তেহাযার স্রাব দেখা দিলে রোজা ছেড়ে দেয়ার অবকাশ নেই। বরং সুস্থ মহিলাদের মত রোজা নামায চালিয়ে যাবে। এমনিভাবে ইস্‌তেহাযা চলাকালে সহবাস করতেও নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই ইস্‌তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণের সাথে স্রাব চলাকালে সহবাস করা যাবে। (রদ্দুল মুহতার : খ. ১, পৃ. ২৯৮ হিন্দিয়া খ. ১ পৃ. ৩৯ ইবনে মাজাহ, দুররুল মুখতার ঐ)

এমনিভাবে ইস্‌তেহাযাগ্রস্ত মহিলা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে, হজ্জের তাওয়াফ ও সায়ী করতে পারবে।

উপরোক্ত বক্তব্যে ইসতেহাযাগ্রস্ত মহিলাকে মাজুর (ওজরগ্রস্ত) মানুষের সাথে তুলনা করে, তার উপরও মাজুরের হুকুম প্রযোজ্য করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, স্রাব চলাকালেও তাদের নামাজ রহিত হবে না।

কাজেই ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির শর্ত-শরায়েতগুলো পাওয়া গেলেই উপরোক্ত ইসতেহাজাগ্রস্ত মহিলার উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। কাজেই ওজরের শর্তগুলো জানা আবশ্যক, যা সামনে আসছে।

এ ধরনের ইসতেহাযাগ্রস্ত মাজুর মহিলাগণের চলমান স্রাব নিয়েই নামাযে দাঁড়াবে। যদিও না রক্ত গড়িয়ে পড়ে তাদের শরীর, কাপড় ও বিছানা ভিজিয়ে দেয়। নামায পড়া অবস্থায় যে রক্ত বের হবে ঐ রক্তসহ নামায আদায় করা তাদের জন্য বৈধ। (দারাকুতনী, খ. ১, পৃ. ২১২, বাইহাকী খ. ১, পৃ. ৩৪৮, ইবনে আবী শাইবা, খ. ১, পৃ. ১২৬)

আর নামায ছাড়া অন্য সময়ে এ ধরনের স্রাব দ্বারা যদি কোন কাপড়ে মেখে যায়, তাহলে ঐ ধরনের কাপড় নিয়ে নামায আদায় করা বৈধ হবে না।

ওজর প্রমাণিত হওয়া ও অব্যাহত থাকার শর্তসমূহ

ওজর প্রমানিত হওয়ার জন্যে একটি শর্ত রয়েছে, আর প্রমাণিত হওয়ার পর তা অব্যাহত থাকার আরেকটি শর্ত রয়েছে।

ওজর প্রমাণিত হওয়ার শর্ত হল, পেশাব, রক্ত বা স্রাব ইত্যাদি প্রকাশ পাওয়ার পর পূর্ণ একটি নামাযের ওয়াক্তে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকা, যেন খুব সংক্ষিপ্ত আকারেও উক্ত ওয়াক্তের ফরজ নামাজটি স্রাবহীন অথবা রক্ত পেশাব অনির্গত অবস্থায় পড়া সম্ভব না হয়। এভাবে যখন একটি নামাযের ওয়াক্ত স্রাব পেশাব বা রক্ত নির্গত হতে থাকবে, তখন থেকে এমন ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত বলে গণ্য হয়ে যাবে। তার উপর মাজুরের (ওজরগ্রস্তের) বিধান আরোপিত হবে।

আর ওজর অব্যাহত থাকার শর্ত হল, ওজর প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে কমপক্ষে একবার হলেও উক্ত স্রাব বা রক্ত প্রকাশ পাওয়া। এভাবে যতদিন ও কাল পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তে একবার করে হলেও ঐ ওজর দেখা দেবে। ততদিন পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি মাজুর (ওজরগ্রস্ত) ব্যক্তি বলেই পরিগণিত হতে থাকবে।

আর যদি কোন ওজরগ্রস্তের ওজর তথা রক্ত, স্রাব পেশাব ইত্যাদির মধ্যে ওজর প্রমাণিত হওয়ার শর্ত না পাওয়া যায়। অথবা প্রমাণিত হওয়ার শর্ত পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু অব্যাহত হওয়ার শর্ত না পওয়া যায়; তাহলে এ ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মাজুরের উপরোক্ত বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে না। বরং তারা স্রাবহীন অবস্থায় না নামায আদায় করবে। এমন সময়ের প্রতিক্ষায় থাকবে যখন রক্ত, স্রাব, পেশাব নির্গত হওয়া বন্ধ থাকে। বন্ধ থাকা অবস্থায়ই নামাযে দাঁড়াবে। স্রাব বা রক্ত ইত্যাদি নিয়ে নামায আদায় করবে না।

এমনিভাবে কুরআন তেলাওয়াত, সেজদায়ে তেলাওয়াত ইত্যাদিও রক্ত অনির্গত ও স্রাবহীন অবস্থায় করবে। স্রাব নিয়ে এসব করা জায়েজ হবে না। তবে সহবাস করা, রোজা রাখা, হজ্জ ইত্যাদি করতে এদের কোন বাধা নেই। এসব আপন গতিতে করে যাবে।

অতএব যদি কোন মহিলার ইসতেহাযা এমন বেশী পরিমাণে না হয়, নিরবচ্ছিন্ন ও একাধারে প্রবাহিত না হয়, এমনিভাবে কোন মহিলার প্রথমে একাধারে ইসতেহাযার স্রাব নির্গত হওয়ার পর যদি ওজর অব্যাহত না থাকে,

অর্থাৎ পরবর্তীতে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তের সর্বনিম্ন একবারও দেখা না দেয় বরং তিন-চার ওয়াক্তে দু-একবার দেখা দেয়।

তাহলে উভয় ধরনের মহিলাগণ মাজুর বলে গণ্য হবে না। প্রথম ধরনের মহিলাগণ শুরু থেকেই মাজুর বলে সাব্যস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় প্রকারের মহিলাগণ যদিও প্রথমে মাজুর ছিল, কিন্তু বর্তমান অবস্থাতে তাদের মাজুরী "ওজরগ্রস্ত) জীবন অবসান হয়ে গেল বল ধার্য হবে।

এ উভয় ধরনের ইসতেহাযাগ্রস্ত মহিলা, যারা মাজুর বলে গণ্য হবে না, তারা স্রাব চলমান অবস্থায় নামায পড়তে পারবে না। এ অবস্থায় নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে না।

কাজেই তারা খেয়াল রাখবে, নামাজের ওয়াক্তের মাঝে কখন তারা ইসতেহাযার স্রাবহীন ফাঁকা সময় পায়। যখনই নামায পড়ার মত সুযোগ পাবে তখনই নামায আদায় করে নিবে।

তবে একথা ভালভাবে মনে রাখতে হবে। মাজুর ব্যক্তির জন্যে যথাসাধ্য এ চেষ্টা করা আবশ্যক, যেন সে নাপাকি নির্গত হওয়া রোধ করে নামায আদায় করে। কাজেই যদি তুলা ইত্যাদি পুরুষাঙ্গে ও যোনিপথে রেখে দিয়ে পেশাব ও ইযতেহাযার স্রাব ইত্যাদি বন্ধ করতে পারে; তাহলে এ ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করা তার জন্যে আবশ্যক।

হাদীসে এসেছে, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ইসতেহাযাগ্রস্ত মহিলার ব্যাপারে বলেছিলেন :

فَاذَا خَلَّفْتِ ذَالِكَ فَلْتغْتَسِلُ ثُمَّ لِتَسْتَنْفِرِىْ بِتَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ۔

অর্থ : যখন তুমি হায়েযের পূর্বোআদত বা অভ্যাসগত মেয়াদ পার করবে; তখন তুমি গোসল করবে। অতঃপর যোনিপথে তুলা রেখে কিছুটা চওড়া কাপড় দিয়ে তা যেন লেংটির মত করে শক্ত করে বেঁধে নিবে। অতঃপর নামায আদায় করে নিবে। (মুয়াত্তায়ে মালেক, দারেমী, মেশকাত : খ. ১, পৃ. ৫৭)

এমনিভাবে মাজুর ব্যক্তি বসে নামায আদায় করলে যদি আপন ওজরগ্রস্ত নাপাকী, পেশাব, ইসতেহাযার স্রাব ইত্যাদি নির্গত হওয়া বন্ধ থাকে, তাহলে বসেই নামায আদায় করা তার জন্যে আবশ্যক। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা বৈধ নয়।

অস্বাভাবিক ইস্‌তেহাযার বিবরণ ও তাতে নামায রোজা ইত্যাদির বিধান

এ পর্যন্ত আমরা যে ইস্‌তেহাযার বিবরণ দিলাম তা স্বাভাবিক ও সাধারণ ইস্‌তেহাযা। কিন্তু অনেক মহিলা ব্যাতিক্রমধর্মী ইস্‌তেহাযার শিকার হয়। অস্বাভাবিক ইস্‌তেহাযায় আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ তাদের স্রাব শুরু হওয়ার পর বন্ধ হয় না। বরং চলমান থাকে। পবিত্রতার পর্ব আর তাদের জিন্দেগীতে আসে না। এ ধরনের ব্যাতিক্রমধর্মী অস্বাভাবিক স্রাবের মহিলাগণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। যাদের জীন্দেগীতে সর্বপ্রথম স্রাব প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে তা চলমান থাকে, বন্ধ হয় না। এ ধরনের মহিলাদেরকে বলা হয় মুবতাদিয়া মহিলা।

২। যে সমস্ত মহিলাদের দু'একটি পবিত্রতা ও হায়েয এক নিয়মে ও ধারাতে অতিক্রান্ত হয়ে থাকে। অথবা আরো অধিক হায়েয ও পবিত্রতা অতিক্রান্ত হয়ে থাকে। অথবা শুধু একটি হায়েয ও পবিত্রতা অতিক্রান্ত হয়ে থাকে। অতঃপর স্রাব চালু হয়ে অব্যাহত থাকে। এ ধরনের মহিলাদেরকে মু'তাদা বা অভ্যাস বিশিষ্ট ইস্‌তেহাযাগ্রস্ত মহিলা বলা হয়।

৩। যাদের দু'একটি বা অধিক পবিত্রতা ও হায়েয অতিক্রান্ত হয়েছে ঠিক, কিন্তু তারা পূর্বো হায়েয ও পবিত্রতার দিন ও সময় ভুলে গিয়ে থাকে। তাদেরকে মুতাহাইয়্যেরা বা মুদিল্লা বা দ্বল্লা মহিলা বলা, অর্থাৎ হায়েয ও অন্‌হায়েযে দ্বিধাগ্রস্ত মহিলা।

মুবতাদিয়া মহিলার বিধান

মুবতাদিয়া অর্থাৎ যে সমস্ত মহিলার জিন্দেগীতে স্রাব শুরু হওয়ার পর তা চলমান থাকে. বন্ধ হয় না এ ধরনের মহিলাগণ প্রত্যেক মাসের প্রথম দশদিন হায়েযগ্রস্ত হিসাবে পরিগণিত হবে। আর বাকি ২০ দিন পবিত্র ও হায়েয মুক্ত মহিলা হিসাবে বিবেচিত হবে।

অতএব প্রত্যেক আরবী মাসের প্রথম দশদিন এ ধরনের মহিলাদের জন্যে নামায-রোজা সহবাস ইত্যাদি করা হারাম। অর্থাৎ হায়েযগ্রস্তদের জন্যে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ এ ধরনের মহিলাদের জন্যেও নিষিদ্ধ ও হারাম।

আর মাসের বাকি যেদিনগুলো থাকবে, সে দিনগুলোতে নামায-রোজা ইত্যাদি করতে হবে। সহবাসও করা যাবে। তবে দশ তারিখের পর এ ধরনের মহিলাদের জন্যে গোসল করা ফরজ। গোসল করা ব্যতিরেকে নামায-তেলাওয়াত ইত্যাদি করা জায়েয নেই।

আর যদি এ ধরনের মুবতাদিয়া মহিলার অনবরত ইস্‌তেহাযার স্রাবে বিঘ্নতা দেখা দেয়, এবং এর মধ্যে দু'একটি গ্রহণযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা ও হায়েয পরিলক্ষিত হয়, তাহলে এ ধরনের মহিলাগণ মু'তাদা তথা আদতবিশিষ্ট মহিলাদের হুকুমে পরিগণিত হয়ে যাবে।

আর মুবতাদিয়া মহিলার বাচ্চা প্রসবের পর ৪০ দিনের স্রাব নিফাস বলে গণ্য হবে। আর বাকি স্রাব নিফাসের মধ্যে গণ্য হবে না। অতএব চল্লিশ দিন পর্যন্ত এরা নিফাসগ্রস্তদের মত দিনগুজরান করবে। আর তার পর ২০ দিন পর্যন্ত ইস্‌তেহাযাগ্রস্তদের মত আমল করতে থাকবে। এরপর ১০ দিন হায়েয, আর বিশ দিন ইস্‌তেহাযার পরিক্রমার রীতিতে কাটাবে।

মু'তাদা বা অভ্যাসবিশিষ্ট মহিলার বিধান

মু'তাদা মহিলাগণের অস্বাভাবিক স্রাব চালু হওয়ার পূর্বে যেভাবে, যে কয়দিন হায়েয আসত এবং যে কয়দিন পবিত্রতা যেত, সে হিসাবে এ ধরনের মহিলাগণ অস্বাভাবিক স্রাব ও ইস্‌তেহাযার দিনগুলো কাটাবে। যেমন কোন মহিলার ৫ দিন হায়েয আসত, আর দুহায়েযের মাঝে ১৫ দিনের পবিত্রতা অন্তবর্তী হত, তাহলে ঐ মহিলা ৫ দিন হায়েযগ্রস্তদের মত কাটাবে। অতপর ১৫ দিন ইস্‌তেহাযাগ্রস্তদের মত কাটাবে। এভাবে জিন্দেগী গুজরান করতে থাকবে।

এমনিভাবে যে মহিলার, যে কয়দিন হায়েয আসত, সে কয়দিনের স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে। আর যে কয় দিন পবিত্রতা অতিক্রান্ত হত, সে কয়দিনের স্রাব ইস্‌তেহাযার স্রাব বলে গণ্য হবে। (শামিয়া : ১-২৮৬)

তবে এ ধরনের মু'তাদা মহিলার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বিধান প্রযোজ্য হওয়ার জন্যে শর্ত হল, তাদের অস্বাভাবিক স্রাব-পূর্ব পবিত্রতা ছয় মাস কাল থেকে দীর্ঘ না হয়ে থাকা। অর্থাৎ যদি পবিত্রতা ছয় মাস বা তার চেয়ে কম হয়ে থাকে, তখন অস্বাভাবিক স্রাবেও ঐ কয়দিনের স্রাব ইস্‌তেহাযার মধ্যে গণ্য হবে। আর যে কয়দিন পূর্বে হায়েয আসত আর ঐ কয়দিনের স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে।

আর যদি পবিত্রতা ৬ মাসের অধিক কাল ধরে দীর্ঘ হয়ে থাকে, তাহলে অস্বাভাবিক স্রাব চলাকালে তাদের পবিত্রতার মেয়াদকাল ৬ মাস গণ্য করা হবে। অতএব তাদের হায়েযের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ৬ মাস ব্যাপী যে স্রাব দেখতে পাবে তা ইস্‌তেহাযার বলে গণ্য হবে। তাতে ইস্‌তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের মত আমল করতে থাকবে।

ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় হায়েযগ্রস্তদের মত কাটাতে থাকবে। এভাবে দিন গুজরাবে। পূর্বে যে কয়দিন হায়েয এসেছিল ঐ কয়দিনের স্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে। (রদ্দুল মুহতার খ. ১, পৃ. ২৮৬)

আর মু'তাদা-অভ্যাস বিশিষ্ট মহিলার অস্বাভাবিক স্রাবের মাঝে যদি কোন পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা পরিলক্ষিত হয়ে পুনরায় স্রাব চালু হয়ে যায়, তাহলে ঐ মহিলার মু'তাদা জিন্দেগী অবসান হয়ে যাবে। বরং তারা মুবতাদিয়া মহিলা বলে গণ্য হয়ে যাবে।

এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ মহিলাগণ একটি পবিত্রতা দেখতে পাওয়ার পর থেকে মুবতাদিয়া মহিলাদের মত প্রত্যেক মাসে ১০ দিন হায়েয ও ২০ দিন পবিত্রতা রীতিতে জিন্দেগী কাটাবে। যেমনটি মুবতাদিয়া মহিলা করে থাকে।

মুতাহায়্যিরাহ তথা হাযেয-অনহায়েযে দ্বিধাগ্রস্ত মহিলাদের বিধান

যারা ভ্রমের শিকার হয়। পূর্বের হায়েয ও নিফাসের জমানা ও তারিখ সম্পর্কে অথবা কোন একটি সম্পর্কে বিভ্রমের শিকার হয়, তাদেরকে মুতাহায়্যিরাহ বা দাল্লা বা মুদিল্লা মহিলা বলা হয়। এ ধরনের মহিলাগণ ভালভাবে চিন্তা গবেষণা করবে। যদি চিন্তা গবেষণায় ভাল ফলাফল বের হয় অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করার পর এমন প্রবল ধারণা জন্মে যে, অমুক অমুক তারিখে পূর্বে হায়েয আসত, তাহলে অনবরত ইস্তেহাযার স্রাব চলা কালে ঐ দিনগুলো হায়েয বিশিষ্ট মহিলাদের মত কাটাবে।

আর যদি এ ধরনের মহিলাগণ শুধু হায়েযের দিন সম্পর্কে বিভ্রমের শিকার হয়। হায়েযের দিন ভুলে যায়। কতদিন আসত তা স্মরণে না থাকে বরং হায়েয আসার সময় তথা মাসের কোন অংশে আসত, তা স্মরণ থাকে। যেমন কোন মহিলার স্মরণ আছে যে, তার ঋতুস্রাব মাসের শেষে দিকে আসত।

কিন্তু তার একথা স্মরণ নেই যে, কত দিন ব্যাপী হায়েয আসত। তাহলে এ ধরনের মহিলা মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্যে অজু করতে হবে। অর্থাৎ মাজুর ব্যক্তির মত আমল করতে থাকবে। কেননা এদিনগুলো হায়েযের দিন না হওয়া নিশ্চিত।

আর বিশ তারিখ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত ও প্রত্যেক নামাযের জন্যে অজু করে নামায আদায় করতে হবে। কেননা এ দিনগুলোতেও পবিত্রতা ও হায়েযের দোটানা সম্ভবনা প্রবল। আর মাসের শেষ তিন দিনে হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের মত আমল করে যাবে। অর্থাৎ নামায রোজা থেকে বিরত থাকবে। কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআন স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকবে। আরও যত ধরনের আমল হায়েযগ্রস্তদের জন্যে নিষিদ্ধ তা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

আর মাসের শেষ তারিখে গোসল করে নিবে। কেননা এসময় হায়েয শেষ হওয়া নিশ্চিত।

আর যদি মুতাহায়্যিরা মহিলার প্রবল ধারণা হয় যে, বিশ তারিখ থেকে হায়েয আসত। কিন্তু কত দিন আসত, তা নিশ্চিতভাবে স্মরণ নেই। তাহলে ঐ মহিলা ২০ তারিখ থেকে তিনদিন পর্যন্ত নামায রোজা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। এরপর মাসের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্যে গোসল করে নামায রোজা আদায় করতে হবে। (ফতোয়ায়ে শামী : খ. ১, পৃ. ২৮৬)

আর যদি মাসের অন্যান্য তারিখ ও সময়ে হায়েয আসার কথা স্মরণ থাকে। কিন্তু কতদিন আসত তা স্মরণ না থাকে। তাদের হুকুমও পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

যেমন কারো যদি স্মরণ থাকে প্রথম দশ দিনের মধ্যে হায়েয আসত। তাহলে সে মাসের প্রথম সাত দিন অজু সহ নামায আদায় করবে। আর ৮ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত, নামায-রোজা বর্জন করবে এবং অন্যান্য আমল, যেগুলো হায়েয অবস্থায় করা যায় না তা থেকেও বিরত থাকবে। দশ তারিখে মাথায় গোসল করবে। এরপর মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্যে অজু করবে।

এমনিভাবে কারো যদি স্মরণ থাকে যে, ১১ তারিখ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে হায়েয আসত তাহলে তার জিন্দেগীও উপরোক্ত নীতিতে কাটাবে।

আর কারো যদি প্রবল ধারণা হয় যে, মাসের ৫ তারিখে হায়েয আসত অর্থাৎ শুধু তারিখ স্মরণ হয়, কতদিন আসত তা স্মরণ না হয়; তাহলে ৫ তারিখ থেকে তিন দিন পর্যন্ত নামায-রোজা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে। হায়েযগ্রস্ত মহিলাদেরমত আমল করে যাবে। অতপর ৮ তারিখ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযে জন্যে গোসল করতে হবে। ১৪ তারিখের মাথায় গোসল করে নিবে। কেননা ৮ তারিখ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত হায়েয ও হায়েয শেষ হওয়ার মত দোটানা পরিস্থিতি থাকে। তাই সতর্কতাবশত প্রতি ওয়াক্তে গোসল করতে হবে। এরপর মাসের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্যে অজু করতে হবে। যেমন মাসের প্রথম চার দিন অজু করে নামায আদায় করতে হবে।

(ফতোয়ায়ে শামী : খ. ১, পৃ. ২৮৬)

এমনিভাবে মাসের অন্যান্য তারিখে হায়েয আসার বিষয়টি নিদিষ্টভাবে জানা থাকলে অথবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে স্মরণ হলে, এভাবে আমল করে যাবে।

আর যদি পবিত্রতা ও হায়েযের মেয়াদ এমনভাবে ভুলে যায় যে হায়েয ও পবিত্রতা কোনটার দিন-তারিখ স্মরণ না থাকে এবং কোন এক দিকে প্রবল

ধারণাও না জন্মে; তাহলে এ ধরনের মহিলাদের বিষয়টি একটু জটিল ও মুশকিল।

এ ধরনের মহিলাগণ প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তের জন্যে গোসল করতে হবে। এভাবে তারা প্রতেক ওয়াক্তের জন্যে গোসল করে নামায আদায় করবে এবং শতর্কতাবশত পরবর্তী নামাযের আগে পূর্বের নামাযকে দোহরিয়ে নিবে।

(শামিয়া : খ. ১, পৃ. ২৮৭-২৮৮)

মুতাহায়্যিরা মহিলার কুরআন তেলাওয়াত ও স্পর্শ করার বিধান

এ ধরনের মহিলাগণ নামাযে সুরায়ে ফাতেহার পর ছোট সুরা দিয়ে নামায আদায় করবে। লম্বা ও দীর্ঘ সুরা এবং কেরাত দ্বারা নামায পড়বে না। উপরন্তু দোয়ায়ে কুনূত ও দোয়ায়ে মাছূরা ইত্যাদি ঠিক ঠিকভাবেই পড়বে।

(শামিয়া : খ. ১. পৃ. ২৮৮)

এ ধরনের মহিলাগণ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না, এবং কুরআন তেলাওয়াতও করতে পারবে না। তারা যদি কারো কাছ থেকে সেজদায়ে তেলাওয়াত শুনে, তাহলে সাথে সাথে সিজদা করে নিবে। যদি সাথে সাথে না করে থাকে বরং পরে কোন একদিন আদায় করে, তাহলে যে দিন ঐ সেজদা আদায় করে থাকে ঐ দিনের ১০ দিন পর ঐ সেজদা পুনরায় আদায় করতে হবে।

মুতাহায়্যিরা মহিলার রোজা রাখার বিধান

এ ধরনের মহিলাগণ রমজান এলে রোজা রাখবে। রমজান চলে যাওয়ার পর শাওয়াল মাসে পুনরায় ২০ দিনে রোজা কাযা করবে। যদি তাদের স্মরণ থাকে যে তাদের হায়েয রাতে শুরু হতো ও রাতে শেষ হতো। আর যদি দিনে হায়েয আসত ও দিনে বন্ধ হত, এমনটি স্মরণ থাকে অথবা কোন কিছুই স্মরণ না থাকে, তাহলে রমজানের পর ২২ দিন যাবত রোজা কাযা করতে হবে। রমজানের পরপর সাথে সাথে কাযা শুরু করুক; অথবা কিছু দিন পর কাযা করা শুরু করুক, উভয় ক্ষেত্রে একই বিধান।

এ বিধান হল ঐ ক্ষেত্রে যে সময় মোতাহায়্যিরাই মহিলা জানে যে, তার হায়েয মাসে শুধু একবর আসত।

আর যদি কোন মুতাহায়্যিরাহ জানে তার হায়েয মাসে দুবার আসত, অথবা নিশ্চিতভাবে কোনটিই জানতে পারে না, তাহলে এ ধরনের মহিলার হায়েয যদি রাতে আসত এবং রাতে বন্ধ হত তাহলে রমযানের পর পর কাযা করুক অথবা কিছুদিন পর কাযা করুক, উভয় সুরতে ২৫ দিন কাযা করতে হবে।

এবং এ বিধান হল ঐ সময় যখন রমজান ৩০ দিনে অতিক্রান্ত হয়ে থাকে। আর যদি রমজান ২৯ দিনে অতিক্রান্ত হয়, তাহলে রমজানের পর পর কাযা করলে ২০ দিন কাযা করতে হবে। আর কিছু দিন পর কাযা করলে ২৪ দিন কাযা করতে হবে।

আর যদি হায়েয দিনে আসত অথবা রাতে বা দিনে আসাত এমন কোন একটি নিশ্চিতভাবে জানা না থাকে, তাহলে রমজান ৩০ দিনে অতিক্রান্ত হয়ে থাকলে এবং রমজানের পর সাথে সাথে কাযা করলে ৩২ দিন যাবত রোজা কাযা করবে। আর যদি কিছু দিন পর কাযা করে তাহলে ৩৮ দিন কাযা করতে হবে।

আর যদি রমজান ২৯ দিনের অতিক্রান্ত হয়, তাহলে রমজানের পর সাথে সাথে কাযা করলে ৩২ দিন যাবত কাযা করতে হবে; আর যদি কিছু দিন পর কাযা করে তাহলে ৩৭ দিন যাবত রোজা কাযা করতে হবে।

(ফতোয়ায়ে শামী : খ. ১ পৃ. ২৮৮ হিন্দিয়া খ. ১, পৃ. ৪০)

মুতাহায়্যিরা মহিলার হজ্জ পালনের বিধান

আর হজ্জের তাওয়াফগুলোর মধ্যে প্রধান ও ফরজ তাওয়াফ, যাকে তাওয়াফে যিরারত বলা হয় তা এ ধরনের মহিলাগণ হজ্জের মধ্যে আদায় করে যাবে। তা আদায় করার দশ দিন পর পুনরায় কাযা করে নিতে হবে। আর তাওয়াফে সদর যা ওয়াজিব তাওয়াফ, এ ধরনের মহিলা তা আদায় করে যাবে, পরে তা কাযা করা লাগবে না। আর সুন্নত তাওয়াফ তথা তাওয়াফে তাহিয়্যা, এ ধরনের মহিলাগ আদায় করবে না। তা থেকে বিরত থাকবে। (আদ্দুরুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার : খ. ১. পৃ. ২৮৮)

মুতাহায়্যিরা মহিলার সাথে সহবাসের বিধান

এ ধরনের মহিলাগণের সাথে সহবাস করা যাবে না। তারা সহবাস থেকে বিরত থাকবে। যতদিন পর্যন্ত তাদের এ মুতাহায়্যিরা জিন্দেগী বাকি থাকে, এভাবে কাটাতে হবে। (প্রাগুক্ত)

এ ধরনের মুতাহায়্যিরা মহিলা স্রাবের এক পর্যায়ে যদি পূর্নাঙ্গ পবিত্রতা দেখতে পায় এবং পুনরায় স্রাব চালু হয়ে যায়; তাহলে এ ধরনের মহিলাদের মুতাহায়্যিরা জিন্দেগী অবসান হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। তখন এ ধরনের মহিলাগণ মুবতাদিয়া মহিলাদের মত আমল করে যাবে।

আর যদি একটি পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা ও পূর্ণাঙ্গ হায়েয তাদের অনিয়ম স্রাবের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তারা মু'তাদা মহিলাদের মত আমল করবে। মুতাহায়্যিরা জীন্দেগী অবসান হয়ে গেছে বলে পরিগণিত হবে।

(শামিয়া : খ. ১, পৃ. ২৮৬)

অনিয়ম ইস্‌তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণের ইদ্দত পালনের বিধান

মুবতাদিয়া ও মু'তাদা মহিলাগণের হায়েযের দিন ও পবিত্রতার দিন জানা থাকে। তাই তাদের ইদ্দত পালনে কোন সমস্যা হয় না। কেননা হায়েযগ্রস্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত হায়েযের মাধ্যমে পালন করা হয়। আর এ ধরনের মহিলাদের হায়েযের দিনে কোন অস্পষ্টতা নেই। তাই হায়েযের দিন হিসাব করে এ ধরনের মহিলাগণ আপন ইদ্দত পালন করে নিবে।

তবে মু'তাদা মহিলাদের ক্ষেত্রে একটি শর্ত হল তাদের পবিত্রতা ছয় মাস ও তার কম সময়ব্যাপী হতে হবে। পক্ষান্তরে যদি ছয় মাসের দীর্ঘ সময়ব্যাপী পবিত্রতা অতিবাহিত হওয়ার অভ্যাস এ ধরনের কোন মহিলার পূর্বে থেকে থাকে, তাহলে এ ধরনের মহিলাদের পবিত্রতার মেয়াদ ৬ মাস ধার্য করা হবে। অতএব হায়েযের পূর্বের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ৬ মাস ব্যাপী পবিত্রদের মত জীবন যাপন করবে এবং পুনরায় হায়েযের দিনগুলো হায়েযগ্রস্তদের মত কাটাবে। এভাবে জিন্দেগী কাটাবে। (শামিয়া : খ. ১, পৃ. ২৮৬)

কাজেই এ ধরনের মু'তাদা মহিলা ইদ্দত পালন করবে ১৯ মাস দশ দিনের দীর্ঘ মেয়াদ দ্বারা। তালাকের পর ১৯ মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা তাদের ইদ্দত খতম হয়ে যাবে।

আর মুতাহায়্যিরা মহিলার ইদ্দতও পূর্বোক্ত মু'তাদা মহিলার মত। মুতাহায়্যিরা মহিলাগণের হুকুম শুধু ইদ্দত পালনের ক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত মু'তাদা মহিলাদের মত, তা ছাড়া নামায রোজা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা কিভাবে দিন গুজরান করবে তা পূর্বে বলে এসেছি।

অতএব মুতাহায়্যিরা মহিলাগণও ১৯ মাস ১০ দিনের মেয়াদ দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। অতএব তালাকে পর ১৯ মাস ১০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারা ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। (শামিয়া : খ. ১, পৃ. ২৮৬ ও ২৮৮ পৃ.)

সাদা স্রাব ও লিকুরিয়ার বিধান

ইসতেহাযা বা রোগের স্রাবের এতক্ষণ যে বিবরণ পেশ করা হয়েছে তাতে সাদা স্রাবের বিষয়টি আলোচিত হয়নি। কেননা, পূর্বের আলোচনার হায়েযের রঙের ইসতেহাযার বিষয়টিই মৌলিকভাবে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল।

অনেক মহিলা সাদা স্রাবের শিকার হয়ে থাকেন। হায়েযে দিনগুলোর পার হওয়ার পর দুএক দিন বা লাগাতার কয়েকদিন পর্যন্ত সাদা স্রাব এসে থাকে। আবার অনেকের তা লেগেই থাকে। যা রোগের কারণে হয়ে থাকে।

এমনিভাবে রোগের কারণে, নিফাসগ্রস্ত মহিলাগণ নিফাস বন্ধ হওয়ার পর দীর্ঘ সাদা স্রাবের শিকার থাকেন। যাকে ডাক্তারি মতে লিকুরিয়া বলা হয়। যদিও জনসাধারণ সব ধরনের সাদা স্রাবকে লিকুরিয়া বলে থাকেন।

লিকুরিয়া ও সাদা স্রাব যেহেতু হায়েয নয়, এটা নিশ্চিত। তাই তার হুকুম নির্ণয় করাও কঠিন নয়। যদিও অন্য রঙের ইসতেহাযায় বিভিন্ন ধরনের জটিল বিধানের বিবরণ উপরে গত হয়েছে।

এ ধরনের সাদা স্রাবে শিকার মহিলাগণ মাজুর ব্যক্তির মত আমল করবে, নামায, রোজা করতে হবে, তা ছাড়া যাবে না। তেলাওয়াত ও কুরআন স্পর্শ করা, মসজিদে প্রবেশ ইত্যাদিও করে যাবে। সহবাসও করে যাবে। তাতে কোন নিষিদ্ধতা নেই।

তবে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্যে অজু করতে হবে। ঐ অজু দ্বারা যত ইচ্ছা নামাজ পড়তে পারবে। তেলাওয়াত করতে পারবে। সেজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করতে পারবে। তবে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার দ্বারা ঐ অজু ভেঙ্গে যাবে। নতুন অজু করে পরবর্তী ওয়াক্তের নামায আদায় করতে হবে।

পূর্বোক্ত মাজুর ব্যক্তির বিধান প্রযোজ্য হওয়ার জন্যে শর্ত হল, গোটা একটি নামাজের ওয়াক্ত এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে স্রাব চলতে হবে যে, তাতে স্রাবগ্রস্ত মহিলা ঐ ওয়াক্তের ফরজ নামাযটুকু আদায় করার সুযোগ না পায়। অতঃপর প্রতি ওয়াক্তে এ স্রাব একবার হলেও দেখা দিতে হবে। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আর যদি এসব শর্ত না পাওয়া যায় তাহলে, কিভাবে আমল করবে, তা পূর্বে ইস্তেহাযার বিধি-বিধান সংক্রান্ত আলোচনায় আলোকপাত হয়েছে। সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

পবিত্রতা অস্বাভাবিক লম্বা হতে থাকলে তখন যেভাবে দিন গুজরান ও ইবাদাত-বন্দেগী করবে

পূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, অনেকের পবিত্রতা ১ বছর অথবা ২ বছর বা ততধিক কাল পর্যন্ত দীর্ঘ ও প্রলম্বিত হয়ে থাকে। এমনকি অনেকের দু'একবার বা ততধিক বার হায়েয আসার পর পুরো জিন্দেগী ভর আর স্রাব আসে না।

এ সকল মহিলাগণ রোজা-নামায ছাড়বে না। বরং রীতিমত রোজা-নামায করতে থাকবে এবং তেলাওয়াত ও অন্যান্য আমল করতে কোন নিষিদ্ধতা নেই। কেননা আমরা পূর্বে বলে এসেছি, নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে প্রধান ও মৌলিক বিষয় হল স্রাব চালু হওয়া। আর এদের স্রাব প্রকাশ পায়নি। তাই এরা নিষিদ্ধতার আওতায় পড়বে না।

আর কিছু মহিলাদের হায়েয আসার বয়স থেকেই স্রাবহীনতা দেখা দেয়। তা দীর্ঘ হতে হতে কারো কারো গোটা জিন্দেগীব্যাপীও দীর্ঘ হয়ে থাকে। তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। তারাও নামায-রোজা করে যাবে। (শামী : খ. ১, পৃ. ২৮০)

আর তাদের ইদ্দত পালনের বিধান ইদ্দতের আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা হায়েয নিরাশা মহিলাদের মত মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। অর্থাৎ তালাক ও স্বামীর মৃত্যুর পর ৩ মাসকাল অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারা তাদের ইদ্দত নিঃশেষ হয়ে যাবে।

পরিশিষ্ট

হায়েয সম্পর্কে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের অপরাধের কারণে মহিলাগণ হায়েযের শিকার হয়েছিল। তাদের থেকেই হায়েযের সূচনা হয়েছিল। মূলত একথাটি সঠিক নয়। কেননা এতদসংক্রান্ত যে রেওয়ায়েত রয়েছে তা সহীহ নয়।

পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, বনী আদমের সকল নারী হায়েযের শিকার হয়ে থাকেন। কাজেই পৃথিবীর সূচলালগ্ন থেকেই নারীদের এ বিষয়টি বরাবর ছিল, এটাই স্বাভাবিক। বরং এটিও কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত হাওয়া আ. গন্দম খাওয়ার পর তিনি এ স্রাবের শিকার হয়েছিলেন। তার থেকে এ ধারা চলে আসছে। এ বর্ণনা দ্বারা বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

মহিলাদের জন্য এটা অবধারিত। তারা এ স্রাবের শিকার হয়েই থাকেন। এটাই তাদের জন্যে খোদায়ী ফায়সালা। এটাই তাদের ব্যাপারে তাকদীরের লিখন। অথচ অনেক মহিলা তাকে খুব ঝামেলা মনে করেন। নিজের জন্যে তা দুর্ভোগ মনে করেন। অসহনীয় ভাবেন এবং তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন।

অথচ এমনটি করে তার কোনই ফায়দা নেই, বরং তাতো তার জন্যে অবধারিত। ভাল মনে করলেও আসবে, আর খারাপ মনে করলেও তা থেকে বাঁচতে পারবে না।

কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে তা অবনত মস্তকে গ্রহণ করে নেয়া। তাতে অসন্তোষ প্রকাশ না করা। কেননা তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা মানে খোদায়ী হুকুমে অসন্তোষ প্রকাশ করা। যা নিতান্ত মন্দ ও গর্হিত কাজ।

পক্ষান্তরে দুঃখে-মসিবতে, একজন মুমিনের জন্যে করণীয় হল, ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ তায়ালার দিকে আত্মনিবিষ্ট করা। রাসূলে আকরাম সা. এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোন পেরেশানির শিকার হতেন, তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে :

عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهٗ كُلَّهٗ خَيْرٌ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهٗ ، وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهٗ۔

অর্থ : "মুমিনের বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের। তার প্রত্যেকটি বিষয়েই কল্যাণ রয়েছে। যদি তার কোন খুশির বিষয় সাধিত হয়, আর তাতে সে শুকরিয়া আদায় করে তাহলে তা তার জন্যে কল্যাণজনক হবে।

আর যদি তার কোন বিপদাপদ পৌঁছে, আর তাতে সে ধৈর্য ধারণ করে তাহলে তা তার জন্যে কল্যাণজনক হবে।"

মানুষের জীন্দেগীতে দুটি হালত আর অবস্থা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। হয়ত সুখ-আনন্দ, নয়ত দুঃখ-মসিবত। সুখানন্দে করণীয় হল শুকরিয়া জ্ঞাপন। আর দুঃখ-মসিবতে করণীয় হল ধৈর্য-সবর।

এতে নিহিত রয়েছে বান্দার ইহকালীন-পরকালীন প্রভূত কল্যাণ। কিন্তু দুটি হলতে অন্যথা করারও সুযোগ রয়েছে। সুখ-আনন্দ ও ভাল অবস্থায় গৌরব-অহংকার করা যায়, নিজেকে বড় মনে করা যায়। তা নিজের হাতের কামাই মনে করা যায়।

আর দুঃখ-মসিবতে অধৈর্য হয়ে পড়া যায়। আল্লাহ তায়ারা সম্পর্কে সংকীর্ণমনা হওয়া যায়, তাকে দোষারোপ ও গালি-গালাজ করা যায়। উভয় অবস্থায় এ ধরনের মন্দ দুটি প্রতিক্রিয়া ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি ডেকে আনে।

প্রকৃত সত্য কথা হল, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির পূর্বে থেকেই সুখ-দুঃখ তার জন্য অবধারিত করে রেখেছেন। কাজেই তা সে মোতাবেকই মানুষের জীবনে ফলবে। চাই তা মানুষ মেনে নিক আর না নিক।

নবীদের কাহিনী দেখা যাক। হযরত সুলাইমান আ. কত মহান বাদশাহীর অধিকারী ছিলেন। তিনি এ মহান নেয়ামত প্রাপ্ত হয়ে কিভাবে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছিলেন।

তার ভাষ্য কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْ اَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ۔

অর্থ : এতো সবই আমার মহান প্রভুর অনুগ্রহে। তিনি আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে, যে আমি শুকরিয়া আদায় করি, নাকি কুফুরি করি।

অন্যদিকে বিখ্যাত তাবেয়ী, হযরত ওরওয়া রহ. একই বছরে আপন একজন বৎসকে হারিয়ে ছিলেন। একটি পাও হারিয়েছেন। রোগের কারণে তা কেটে ফেলা হয়েছিল।

আপনজনের কাছে ফিরে আসার পর তারা বলল : তুমি তো অনেক বড় মসিবতের শিকার হয়েছো! তিনি বললেন, না। তোমরা এমন বলতে যেও না।

মহান রব্বুল ইজ্জত আমাকে চারটি সন্তান দিয়েছেন। তার থেকে নিয়েছেন মাত্র একটি। আর আমার জন্যে রেখেছেন বাকি তিনটি।

এমনিভাবে মহান প্রভু আমাকে চারটি হাত-পা দিয়েছেন। তার থেকে তিনি নিয়ে গেছেন একটি। আর আমার জন্যে রেখেছেন বাকি তিনটি। তিনি যা নিয়েছেন তা অনেক কম ঐসব থেকে, যা তিনি আমার জন্যে রেখেছেন।

মহিলাগণও এভাবে যদি দেখে তাহলে তারা মহান রবের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে বাধ্য হবে। কেননা তিনি পুরো মাসই তাকে সুস্থ রাখছেন। মাসে কেউ শুধু তিন দিন অসুস্থ থাকে, কেউ ৪দিন অসুস্থ থাকে, যা সুস্থতার তুলনায় বড়ই স্বল্প।

মানুষ তার প্রত্যেক পদক্ষেপে এমন ভাল ও সুন্দর ভাবনা তৈরী করতে পারে। ভাল কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা যোগাতে পারে। যা তার জন্যে বড়ই সুখ বয়ে আনতে; সহায়ক হবে। পক্ষান্তরে মন্দ কল্পনা-জল্পনাও করতে পারে, তার জন্যে পেরেশানি-দুশ্চিন্তার রাস্তা সুগম করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

নারীদের জন্যে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। তারা একটু বিপদাপদে পড়লেই অস্থির হয়ে যায়। ব্যাকুল হয়ে পড়ে। স্বামীকেই খাওয়ানোর মালিক মনে করে।

অথচ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার উপর অবিচল আস্থা-বিশ্বাস রাখা হল মুমিনের প্রধান কর্ম। হযরত হাজেরার মতো মহান মনীষী মহিলার জীবনের প্রতি তাকান।

হযরত ইবরাহীম আ. যখন তাকে মক্কাভূমিতে রেখে যাচ্ছিলেন, যেথায় কোন জন-মানব ছিল না। কোন পশু-পাখি, গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি কিছুই ছিল না। সাথে ছিল কিছু শুকনো খাবার, আর কিছু পানি।

এমতাবস্থায় হযরত ইবরাহীম আ. তাকে রেখে যাচ্ছিলেন। হাজেরা তাকে পিছন থেকে ডাকলেন, তিনি পিছনে তাকালেন না। আবার ডাকলেন, তিনি সারা দিলেন না। আবার ডাকলেন, তিনি সারা দিলেন না।

এবার হাজেরা বুঝে ফেলেছেন। তিনি ইবরাহীম আ.-কে লক্ষ্য করে বললেন : তাহলে কি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রেখে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন? ইবরাহীম আ. বললেন হ্যাঁ!

তখন হাজেরা দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলেছিলেন– إِذَا لَا يُضَيِّعُنَا

অর্থ : তাহলে কখনই তিনি আমাদেরকে হালাক করবেন না।

এ যুগের মেয়ে হলে হয়তো বলত, হে ইবরাহীম! রাখ তোমার নবুয়তী! রাখ তোমার সুফিবাদ! বরং তুমি আমার খাবার-পানির ব্যবস্থা করে যাও।

থাকার সুব্যবস্থা করে যাও। যা দেখছি, তাতে তো তুমি আমার সন্তান ও আমাকে ধ্বংস করার একটা ফন্দি এঁটেছ।

অথচ হাজেরা আপন প্রভুর আস্থা-বিশ্বাস এবং প্রভুর হুকুমের আজ্ঞাবহ ও আনুগত্যে যখন চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, সার্বিক দিক থেকে ত্যাগ কুরবানীর গ্লানি উঠিয়েছিলেন, যাবতীয় পরীক্ষা হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন।

সম্মানিত নবী ও রাসূল হযরত ইবরাহীম আ. এর অভিযোগ-অনুযোগ থেকে আত্মসংবরণ করেছিলেন। তার দোষ-ত্রুটি, অভিশাপ-ভর্ৎসনা থেকে নিজের দামান মুক্ত রেখেছিলেন। আল্লাহর তায়ালার উপর জুলুম-নির্যাতনের অভিযোগের বাগডোর চেপে ধরেছিলেন।

তখন তাকে আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুসলিমার জন্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মাঝে এক জ্বলন্ত উপমা হিসেবে গণ্য করেছেন। কাজেই মুসলিম উম্মাহ এ মহান মনীষীর স্মৃতিচারণ করতে হয়।

তার স্মৃতি-বিজড়িত সে মক্কাভূমির স্থান ঘুরে ঘুরে মুসলিমগণ বড়ই পুলক অনুভব করে। জ্বলন্ত অঙ্গারে গাত্রদাহনের মত কঠিন কঠিন পরীক্ষাগুলো কিভাবে তিনি দক্ষতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তা ভেবে ভেবে শরীরে শিহরণ জাগে, আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে।

এসব শুধু একমাত্র হাজেরা আ. এর আত্মবিশ্বাসের ও ঈমানের স্বচ্ছ সফলতার কারণেই, বদৌলতেই।

আমি খুব অবাক হই, যখন হযরত ইবরাহীম আ. ও তাঁর পরিবারবর্গের ঈমান-ইয়াকীন, বিশ্বাস আর আনুগত্য-আজ্ঞাবহের বিষয়গুলো কুরআন ও হাদীসে পড়ি। তা নিয়ে ভাবি। তাইতো আল্লাহ তায়ালা তাকে উম্মতের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন। প্রতিনিয়ত তার উপর আমরা দুরূদ পাঠ করে থাকি।

তো কথা হল, চিন্তা-চেতনা ভাল রাখা। আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা মেনে নেয়া। এগুলোই একজন মুমিনের জন্যে শোভনীয়। এতেই কল্যাণ, এতেই সুখ-শান্তি।

অন্যথায় দেখা যাবে, কল্পনা-জল্পনা করে করে তিলকে তাল বানাতে যাবে, তুচ্ছ-তুচ্ছ জিনিস নিয়ে পেরেশানি আর দুঃখ-মসিবতে জড়াতে যাবে। যা কখনই কাম্য নয়।

বক্ষমানগ্রন্থে মহিলাদের হায়েয-নিফাস ও ইসতেহাযার বিষয়গুলো একটু বিশদভাবেই আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যা পাঠক পড়ে এসেছেন। এ চিন্তা-ভাবনা থেকে গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে যেন নারীগণ আপন স্রাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

অতঃপর সে সম্পর্কে শরয়ী সমাধানও জানতে পারে এবং তদানুযায়ী আমল করতে পারে।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে তার নিত্যদিনে শরীয় বিধি-বিধান পালন করা যেমন আবশ্যক। তেমনিভাবে নিত্যদিনের বিধি-বিধান পালন করার জন্য যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন এতটুকু জ্ঞানও অর্জন করা আবশ্যক ও ফরজ।

আর হায়েয-নিফাস যেহেতু মহিলাদের অবিচ্ছেদ্য বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত, তাদের নামায-রোজায় সেগুলোর বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। তাই হায়েয-নিফাস আর ইসতেহাযার বিষয়গুলো আয়ত্ত্ব করা তাদের জন্যে ফরজ।

এমনিভাবে সেগুলোর শরয়ী আহকাম জানাও ফরজ। অতএব খুব গুরুত্বের সাথে প্রত্যেক মহিলার জন্য এ বিষয়গুলো আয়ত্ত্ব করে নেয়া জরুরী। এতে অবহেলা করা ফরজ বিধানের অবহেলার নামান্তর হবে।

যারা গ্রন্থটি মনোযোগ সহকারে পড়েছেন, তারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, পবিত্রতা আর স্রাবে কত ধরনের পরিবর্তন হতে থাকে। সামান্য পরিবর্তনের কারণে হুকুমে কত বিস্তর তফাৎ হয়ে থাকে।

কাজেই খুব চৌকান্নার সাথে স্রাব ও পবিত্রতার প্রতি খুব লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যত্ন সহকারে তা সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে প্রত্যেকে তার হায়েযের মেয়াদ ও তারিখ এবং পবিত্রতার মেয়াদ ও তারিখ লিখে রাখবে। নিফাসের মেয়াদ লিখে রাখবে।

হায়েয ও নিফাসের মাঝে যদি কোন ধরনের স্রাবহীনতা পরিলক্ষিত হয় তাও লিখে রাখবে। যাতে পরবর্তীতে কোন সমস্যায় পড়তে না হয়। মুতাহায়্যিরা মহিলা বিধানে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে, এসব সংরক্ষণ না থাকার কারণে কত জটিলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাজেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট হওয়া চাই।

মেয়েরা যখন প্রথম হায়েযগ্রস্ত হয়, তখন অনেক অভিভাবক লজ্জার বশবর্তী হয়ে তার খোঁজ খবর নেননা। আর অবলা মেয়েটি কারো কাছে তা প্রকাশ করে না। সে সম্পর্কে ভালভাবে জানতে চায় না। অথচ এমনটি করা ঠিক নয়।

বরং অভিভাবকের দায়িত্ব হল তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। কোনভাবে বিষয়গুলো তাকে জানিয়ে দেয়া। যাতে তার নামায-রোজাতে কোন ব্যাঘাত না হয় এবং

মেয়েরা যেহেতু অল্প বয়সে এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না তাই এসব হিসাব-নিকাশের বোঝা মাথায় নিতে চায় না। তাকে অযথা অনর্থক কাজ মনে করে। কাজেই অভিভাবকগণ আপন মেয়েদের হিসাব নিকাশ রাখা চাই। যাতে সমস্যার সময়ে জটিলতা এড়াতে, তারা অবুঝ মেয়েটিকে সহায়তা করতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে বা বিষয়ে যারা লজ্জা করে তারা ভুল করে থাকে। শরয়ী বিষয়ে লজ্জা করার কি অর্থ আছে?

বিবাহ-বিচ্ছেদে ইসলামী বিধান

মাওলানা মিজানুর রহমান
সহকারী মুহাদ্দিস, টঙ্গী দারুল উলূম মাদরাসা

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ শুধু দ্বিপাক্ষিক একটি চুক্তিই নয়; বরং এটি একটি স্বতন্ত্র ইবাদতও বটে। তাই বিবাহের প্রতি ইসলাম উৎসাহও প্রদান করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– ' তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি বিবাহ করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে।'

এ কারণেই অন্যান্য সকল লেনদেন বা চুক্তির তুলনায় বিবাহ স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। আর যেহেতু বিবাহের মাঝে ইবাদতের দিকটিই প্রধান, তাই এর বিচ্ছেদ তথা তালাকের জন্যও কিছু স্বতন্ত্র নীতিমালা রয়েছে, যা ইসলাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে।

ইসলাম বিবাহকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আখ্যা দিয়ে এ নির্দেশনা প্রদান করে যে, বিবাহের মাধ্যমে স্থাপিত সম্পর্ক যেন চিরস্থায়ী হয়। এ সম্পর্ক যেন কখনো ভেঙে না যায়। বরং যে সমস্ত আচার-আচরণ এ সম্পর্কের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে বা তা ভেঙে দেয়ার পথকে সুগম করে সেগুলোর পথ রুদ্ধ করতে পবিত্র কোরআন বিশেষ কিছু পন্থা বর্ণনা করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَاللّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ○ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُّرِيْدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ○

(سورة النساء ٣٤-٣٥)

'আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদের সদুপদেশ দাও। তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার করো, যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ। আর যদি তাদের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতিরই আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন

সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝে কল্যাণের ব্যবস্থা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সবকিছু অবহিত।'

(সূরা নিসা : ৩৪-৩৫)

আয়াতে বর্ণিত সবগুলো পন্থা অবলম্বন করার পরও যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমঝোতা না হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে তাদেরকে একই বন্ধনে আবদ্ধ রাখা তাদের উপর যুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। জোরপূর্বক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখার দরুণ কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের তুলনায় ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। পারিবারিক সুখ-সাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে নরকে পরিণত হবে তাদের এ পৃথিবী। আর এজন্যই ইসলামে তালাকও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অন্যান্য ধর্মের মতো বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যধারণের ক্ষমতা পুরুষের মধ্যে বেশি, তাই তালাকের অধিকার পুরুষকেই দেয়া হয়েছে। এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেয়া হয়নি। যাতে সাময়িক বিরক্তির প্রভাবে এবং সামান্য কারণে স্ত্রীলোক কর্তৃক তালাক দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি না পায়।

তবে স্ত্রী জাতিকে এ অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিতও করা হয়নি। স্বামীর জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যও রয়েছে। তারা শরয়ী কাযীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে।

পুরুষকে যদিও তালাক দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। একমাত্র অপারগ অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

أبغض الحلال إلى الله الطلاق۔ (ابوداود)

'আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক। ইসলামী শরীয়ত যেহেতু বিবাহ বিচ্ছেদকে বৈধ কাজসমূহের মাঝে সর্বাধিক ঘৃণিত কাজ করে আখ্যা দিয়েছে এবং অপারগতার সময় যদিও কাজটি করার বিধান দিয়েছে তথাপি সম্পর্কটি ছিন্ন করার বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি নীতিমালাও প্রদান করেছে। যার মাঝে এ বিষয়টির প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, সাময়িক কোন দূরত্বের কারণে বা হঠাৎ ঝগড়া-বিবাদের কারণে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এ বিচ্ছেদের ঘটনা যেন না ঘটে। তাই সব সময় সর্বাবস্থায় ইসলাম বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়নি।' বরং পবিত্র কোরআনে فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ বলে তার

একটি নির্দিষ্ট অবস্থা ও সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীকে পূর্ণ পবিত্রতার সময়ে তালাক দিবে। ঋতুস্রাব চলাকালীন নয়, যাতে সাময়িক দূরত্ব তালাকের কারণ হিসেবে দেখা না দেয় বরং এমন পবিত্রকালীন সময়ে তালাক দিবে, যার মাঝে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটেনি। (যেন মহিলার জন্য ইদ্দত পালন কষ্টকর না হয়।)

মোটকথা, শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাকের অধিকার পুরুষের হাতের ছড়ি নয় যে, যখন খুশি যেভাবে খুশি তা ঘুরাবে। বরং শরীয়ত পুরুষকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার আদেশ দিয়েছে আর এ অপেক্ষার মাঝে রাগ ঠাণ্ডা হয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার এবং তালাকের প্রয়োজন না পড়ার খুব সম্ভাবনা থাকে।

পৃথিবীতে যতো ধরনের চুক্তি রয়েছে, শর্ত মোতাবেক তা বাতিলের উদ্দেশ্যে একবার শুধু কলমে বা মুখে বাতিল শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথেই তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর এভাবেকোন ব্যক্তির সাথে চুক্তি বাতিল করার পরক্ষণেই অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করাতে কোন প্রকার বিধি-নিষেধও থাকে না। কিন্তু বিবাহের চুক্তি এতো সহজেই শেষ হয়ে যায় না। শুধু একবার তালাক শব্দ মুখে উচ্চারণ করা বা লিখার দ্বারা এ সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় না। বরং ধাপে ধাপে তিনবার তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান কার্যকর হয়।

প্রকাশ থাকে যে, তিন তালাকের ক্ষেত্রে যে তিনটি স্তরের কথা বলা হয়েছে, এর অর্থ এই নয় যে, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তিনটি স্তরই অতিক্রম করতে হবে; বরং উদ্দেশ্য হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে যেহেতু তালাকের মনস্থ করা অত্যন্ত ঘৃণিত তাই অপারগতার সময়ে যদি এ ঘৃণিত কাজটি করতেই হয়, সে ক্ষেত্রে সর্ব নিম্নস্তর তথা এক তালাক দিয়েই ক্ষান্ত হবে। অতঃপর মহিলার ইদ্দত শেষ হওয়ার অপেক্ষা করবে। ইদ্দত শেষে এই এক তালাকই বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টেনে দিবে এবং মহিলার জন্য অন্যত্রে বিবাহ বৈধ হয়ে যাবে।

এ পদ্ধতি অবলম্বনের রহস্য হলো, 'সরীহ' তথা সুস্পষ্ট শব্দ দ্বারা এক তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে মীমাংসার পথ খোলা থাকে। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। আর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রীর জন্য এ অবকাশ থাকে যে, ইচ্ছে করলে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারে, আবার পূর্বের স্বামীর সাথেও নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু কোন স্বামী যদি এক তালাকের উপর ক্ষান্ত না হয়, তবে সে চাইলে ইদ্দতের মাঝেই ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের পর আবার সুস্পষ্ট শব্দ দ্বারা আর এক তালাক দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে সে বিবাহ বিচ্ছেদের দ্বিতীয় স্তর অযথা অতিক্রম করলো। যার কোনই প্রয়োজন ছিলো না। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে তার ক্ষমতার এ প্রয়োগ অত্যন্ত ঘৃণিত বলে বিবেচিত হবে।

এরপরও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে। অর্থাৎ স্বামী চাইলে ইদ্দতের মাঝে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর ইদ্দতের পর স্ত্রীর জন্য এ অধিকার বহাল থাকে যে, ইচ্ছে করলে পূর্বের স্বামীর সাথে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে, আবার অন্যত্রও বিয়ে বসতে পারে।

এভাবে তালাক দিয়ে তা প্রত্যাহার করে নেয়ার সুযোগ দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক দিবে এবং তা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। তাই এ বিধান রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার জন্য আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকে না। এমনকি যদি উভয়ে রাজি হয়েও পুনরায় বিয়ে করতে চায়, তবুও বিশেষ অবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সবদিক বুঝে-শুনে, বিচার-বিবেচনা করেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই পুনরায় বিবাহের জন্য শর্ত হলো, স্ত্রী ইদ্দতের পর অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○ (سورة البقرة ٢٣٠)

'তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে না করবে, তার জন্য হালাল হবে না। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করতে কোন পাপ নেই; যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছে থাকে। আর এই হলো, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা, যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য তিনি এসব বর্ণনা করেন।' (সূরা বাকারা : ২৩০)

তালাকের প্রকারভেদ

পদ্ধতিগতভাবে তালাক তিন প্রকার

১। 'আহসান তালাক' তথা সর্বোত্তম পদ্ধতি : স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সহবাস বিহীন পবিত্রকালীন (স্রাবমুক্ত) সময়ে এক তালাক দেয়া। যা হবে 'রাজঈ তালাক' তথা প্রত্যাহার যোগ্য তালাক। অতঃপর তার সাথে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবেই সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে। এক্ষেত্রে ইদ্দত শেষে স্ত্রীর জন্য অপর পুরুষের সাথে বিয়ে বসতে কোন বাধা থাকবে না।

২। 'হাসান তালাক' তথা উত্তম পদ্ধতি : স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাস বিহীন তিন 'তুহর' (স্রাবমুক্ত) অবস্থায় তিন তালাক দিবে। একে সুন্নত তালাকও বলা হয়।

৩। বিদাআত তালাক : স্ত্রীকে একই 'তুহর' (স্রাবমুক্ত) অবস্থায় আলাদা আলাদা করে বা একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া। অথবা দুই তালাক একসঙ্গে দিয়ে প্রত্যাহার না করা। অথবা যে তুহরে সহবাস হয়েছে তাতে বা হায়েয অবস্থায় এক তালাক দেয়া। এভাবে তালাক দেয়া কবিরা গুনাহ।

উল্লেখ্য যে, "হাসান তালাক" এর ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের তিনটি স্তরই অতিক্রম করা যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয় তথাপি শরীয়তের আইন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন তিন 'তুহর' এ তিন তালাক হওয়ার কারণে একে 'সুন্নত তালাক' বলা হয়েছে। যার অর্থ এই নয় যে, এমনটি করা সুন্নত বা সাওয়াবের কাজ। বরং প্রকৃত রহস্য হলো, যেহেতু এক 'তুহরে' দুই-তালাক দেয়া অথবা হায়েয অবস্থায় কিংবা সহবাসের তুহরে এক তালাক দেয়া নাজায়েয এবং গোনাহের কাজ এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এভাবে তালাক দেয়াকে বিদআত বলেছেন, তাই এর বিপরীতে উল্লেখিত 'হাসান তালাক' কে 'সুন্নত তালাক' নাম দেয়া হয়েছে, যার অর্থ হলো, এভাবে তালাক দেয়া হারাম, নাজায়েয বা বিদআত নয়।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

السنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل طهر.

'সুন্নত হলো এই, তুমি 'তুহর' এর অপেক্ষা করবে। অতঃপর প্রত্যেক 'তুহর' এ তালাক দিবে। (নসবুর রায়া খ. ৩, পৃ. ২২০)

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আলুসী (রহ.) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত বলে এ উদ্দেশ্য নেননি যে, এমনটি করলে সাওয়াব হবে। কেননা এটি একটি বৈধ কাজ মাত্র। মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো, শরীয়তে এ পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ, এ কারণে কোন শাস্তি হবে না। (রুহুল মাআনী, খ. ২, পৃ. ১৩৬)

এক সাথে তিন তালাক দেয়ার হুকুম

পূর্বে তালাকে বিদআতের আলোচনায় বলা হয়েছে, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এক সাথে এক বাক্যে তিন তালাক দেয় তাহলে স্বামী গুনাহগার হওয়ার পাশাপাশি উক্ত তিন তালাক এক সাথেই পতিত হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জন্য পরিপূর্ণভাবে হারাম হয়ে যায়। ইসলামী আইনের ধারক-বাহক ফুকহায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এক বাক্যে তিন তালাক দেয়া যদিও গোনাহে কবিরাহ এবং শরীয়ত প্রদত্ত নিয়ম-নীতির পরিপন্থী; তথাপি তা কার্যকর হওয়াতে কোন বাধা নেই। যেমনিভাবে কোন কাজ পাপকাজ হওয়া তার প্রভাব সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধক হয় না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হলেও, যাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয় বা কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলি বৈধভাবে নিক্ষেপ করা হলো, কি অবৈধভাবে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব ধর্মেই পাপ এবং ঘৃণ্যতম একটি কাজ, কিন্তু যে অর্থ-সম্পদ চুরি হয়ে গেলো, তা তো হাতছাড়া হয়েই গেলো। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া, এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করে না।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরীয়ত প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রয়োজন ব্যতীত একই সঙ্গে তিন তালাক দেয়া যদিও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর অসন্তুষ্টির কারণ এবং সমগ্র উম্মত এক বাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে এর পরিণতিও তাই হবে, বৈধভাবে অগ্রসর হলে যা হয়। অর্থাৎ, তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহারই নয়, বিবাহ বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না।

তালাক সংক্রান্ত জরুরী কিছু মাসআলা

১. বিনা দোষে তালাক দিলে বা স্ত্রীর অসম্মতিতে কিংবা স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে তালাক দিলেও তালাক হয়।

২. নেশাগ্রস্ত হয়ে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়।

৩. কুফরী কালাম মুখ থেকে বেরোলেও স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। যেমন– জরুরিয়াতে দ্বীন তথা দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় কোন বিষয় অস্বীকার করার দরুণ যেভাবে নতুন করে ঈমান আনতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে নতুন করে বিয়েও পড়াতে হয়।

৪. তালাকের অশুদ্ধ উচ্চারণেও তালাক হয়ে যায়।

৫. রাগ করে কিংবা হাসতে হাসতে স্ত্রীকে 'তালাক প্রাপ্ত' বলে ডাকলে তালাক হয়ে যায়।

৬. সাক্ষী ছাড়া তালাক দিলেও তালাক পতিত হয়।

৭. রাগের মাথায় তালাক দিলেও তালাক হয়।

৮. জবরদস্তি করে তালাক দেয়ালেও তালাক হয়।

৯. নাবালেগ, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক পতিত হয় না।

১০. স্বামীর পিতা পুত্রবধূকে তালাক দিতে পারে না।

১১. স্বামীকে বাবা বা ভাই বললে তালাক হয় না।

১২. হায়েয- নেফাস তথা ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে তালাক দেয়া পাপ, তবে এমতাবস্থায় কেউ তালাক দিলে তা অবশ্যই পতিত হবে।

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

১. কুরআনুল কারীম
২. আল জামেউল বুখারী
৩. সহীহ মুসলিম
৪. আল জামেউত তিরমিযী
৫. সুনানে আবু দাউদ
৬. সুনানে ইবনে নাসাঈ
৭. সুনানে ইবনে মাজা
৮. মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক
৯. মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ
১০. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা
১১. মুসনাদে আবী ইয়ালা
১২. মুসনাদে আবু দাউদ আততুয়ালেসী
১৩. মুজামে কারীব
১৪. মুজামে সগীর
১৫. মুজামে তবরানী
১৬. ইবনে আদী
১৭. বাইহাকী
১৮. দারেমী
১৯. দারাকুতনী
২০. বাদায়েউ সানায়ে
২১. ফাতহুল কাদীর
২২. ফাতাওয়াযে খানিয়া
২৩. আদ দুরুল মুখতার
২৪. আর ইনায়া
২৫. রদ্দুল মুহতার শামি
২৬. হিন্দিয়া
২৭. উসতাদু রেয়াআ।



মাকতাবায়ে ইবনে ওবায়েদ
কুঞ্জেরহাট, বোরহানউদ্দিন, ভোলা